রোকেয়ানামা

সাজিদ হাসান[১]

‘জাগো গো ভগিনী!’

বিখ্যাত এই স্লোগানের রচয়িতা বেগম রোকেয়াকে আপনারা সবাই চেনেন। স্কুল-কলেজে রোকেয়ার লেখা ও তার সংক্ষিপ্ত জীবনী পড়েছেন। সত্যি বলতে, স্কুল কলেজে পা রেখেছেন কিন্তু রোকেয়াকে চেনেন না—এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার।

বেগম রোকেয়া এমন এক ব্যক্তি, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে আজ পর্যন্ত যিনি শিক্ষিত মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে বেশ আলোচিত-সমালোচিত। মোটকথা, মুসলিম বাঙালি সমাজে রোকেয়া কখনো অপ্রাসঙ্গিক হননি বা তাকে হতে দেওয়া হয়নি।

বাঙালি সমাজে রোকেয়া তিনটি কারণে সবচেয়ে বেশি আলোচিত—

১. **‘নারী অধিকার’ প্রতিষ্ঠায় তার লেখনী**
২. **তার সাহিত্য কর্ম**
৩. **সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা, তথা সেকুলার নারীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তার সামাজিক প্রচেষ্টা**

ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলে (-১৯৪৭ পূর্ববর্তী) ব্রিটিশদের অনুগত, পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ সদস্য (মুসলিম, অমুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই) বেগম রোকেয়ার ‘সামাজিক’ কর্মকাণ্ড, সাহিত্য, ‘নারী জাগরণ’-এর আহ্বানে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। এমনকি কেউ কেউ দাবি করেন, বেগম রোকেয়া আসমান থেকে অবতরণ করা ‘**ঐশী দূত**’। যার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুসলিম নারীদেরকে বর্বর, সেকেলে, কট্টর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজের যুলুমের কারাগার থেকে রক্ষা করা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে (১৮৮০ সাল) রংপুরের এক ধনাঢ্য মুসলিম বাবা-মায়ের ঘরে রোকেয়ার জন্ম। ইতিহাস ও সাহিত্যে বেগম রোকেয়া নামে পরিচিতি পেলেও এটি তার আসল নাম নয়। তার প্রকৃত নাম রোকেয়া খাতুন—এই নামে তিনি সাক্ষর করেছেন। ইংরেজিতে তিনি সাক্ষর করতেন 'Roquiah Khatun' নামে[১]। তবে বিয়ের পরে তিনি সচরাচর বই বা চিঠিপত্রে 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন' বা 'মিসেস আর এস হোসেন' [Mrs. R. S. Hossein] হিসেবে সাক্ষর করেছেন[২]।

রোকেয়ার পিতার নাম জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের (মৃত্যু ১৯১৮)। তিনি ছিলেন ব্রিটিশদের অনুগত একজন জমিদার। আলী সাবের তার বড় দুই ছেলেকে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াশোনা করান।

রোকেয়ার বড়ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহিম ১৮৮৫ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। পিতার মতো বড় বোন করিমুন্নেসারও বিয়ে হয় একজন জমিদারের সঙ্গে[৩]। ওই বছরই (১৮৮৫) কলকাতায় বড় বোন করিমুন্নেসার শ্বশুর বাড়িতে থাকাকালীন ইউরোপীয় গভর্নেসের কাছে কিছুদিন পড়াশোনা করেন বেগম রোকেয়া। বড়ভাই ইব্রাহিমও রোকেয়াকে ইংরেজি শিক্ষা দেন। আর বাংলা শিক্ষা দেন বোন করিমুন্নেসা। এভাবে প্রাথমিক জীবনে ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত বড় দুই ভাই, বোন করিমুন্নেসা এবং গভর্নেস মেমের হাত ধরে রোকেয়ার শিক্ষার সূচনা।

১৮৯৬ সালে বেগম রোকেয়ার বিয়ে হয় ব্রিটিশদের কর্মচারী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খানবাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের[৪] সঙ্গে। রোকেয়াকে **বিয়ের আগে ১৮৮৫ সালে শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিলেতে যান সাখাওয়াত হোসেন**। সেখানেই তিনি পশ্চিমা ও মুসলিম নারীদের পর্দা সহ বিভিন্ন রীতিনীতির

---

[১] মুহম্মদ শামসুল আলম, (১৯৮৯/২০২৩). *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। জীবন ও সাহিত্যকর্ম.* (পৃ-৬০). বাংলা একাডেমী

[২] মুহম্মদ শামসুল আলম, (১৯৮৯/২০২৩). *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। জীবন ও সাহিত্যকর্ম.* (পৃ-৬০, ৬১). বাংলা একাডেমী

[৩] সোনিয়া নিশাত আমিন (২০০২). *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন.* বাংলা একাডেমী

[৪] জন্ম ১৮৫৮, মৃত্যু ১৯০৯

পার্থক্য স্বচক্ষে দেখতে পান। ওই সময় ব্রিটেনে নারীদের ভোটাধিকার ও অন্যান্য অধিকারের দাবীতে দীর্ঘ আন্দোলন চলমান ছিল। এসব কিছুই তিনি প্রত্যক্ষ করে দেশে ফিরে আসেন।

দেশে ফিরে রোকেয়ার সঙ্গে বিয়ের পর স্ত্রীকেও পশ্চিমা কালচারের দীক্ষা দেন সাখাওয়াত হোসেন। রোকেয়ার শুরুর দিকের লেখা রচনাগুলো তিনিই প্রথম পড়ে মন্তব্য করতেন—এ কথা রোকেয়া নিজেই বলে গেছেন। সেই সময়ের তুমুল আলোচিত রচনাগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠানোর ব্যবস্থাও রোকেয়ার স্বামী সাখাওয়াত হোসেনই করেছেন। তাই বলা যায়, বেগম রোকেয়ার 'প্রথা-বিরোধী' ভাবনার চূড়ান্ত বিপ্লব হয়েছে তার স্বামীর হাতে।

বেগম রোকেয়াকে যত্নের সঙ্গে ইংরেজি শেখান সাখাওয়াত হোসেন। বিহারের ভাগলপুরের সাখাওয়াত ছিলেন উর্দুভাষী, বাংলায় তার দখল অতটা ছিল না। এভাবে করিমুন্নেসার কাছে বাংলা, ভাই ও স্বামীর কাছে ইংরেজির উচ্চতর শিক্ষা পান রোকেয়া। বাংলা, উর্দু, ফার্সি, আরবি ও ইংরেজি—সর্বমোট পাঁচটি ভাষায় বেগম রোকেয়া দক্ষতা অর্জন করেন। সে সময় তো বটেই, এখনকার অবস্থার সাথে তুলনা করলেও রোকেয়ার পাঁচ ভাষা শিক্ষার এ সুযোগকে বেশ দুর্লভ বলতে হয়।

বেগম রোকেয়া নিয়মিত ইংরেজি পত্রিকা ও বই পড়তেন। এসব সম্ভবত তার স্বামীর মাধ্যমে তার হাতে পৌঁছুত। গ্যালিলিও, নিউটন, John Howard Payne, Marie Corelli সহ অতীত ও তৎকালীন অনেক জনপ্রিয়, অজনপ্রিয় ইউরোপীয় ব্যক্তি ও সাহিত্যিকের কর্ম, সাহিত্যের সঙ্গেই তার পরিচয় ছিল। রোকেয়ার লেখায় বিজ্ঞানের তৎকালীন অনেক জটিল বিষয়েরও উল্লেখ পাওয়া যায়। যাতে বোঝা যায়, ইংরেজি অধ্যয়নের সীমা নিতান্ত কম ছিল না তার। এমনকি তার অনেক প্রবন্ধের সঙ্গে পশ্চিমা অনেক সাহিত্যিকের মূলভাবের সাদৃশ্যও দেখা যায়[৫]। তাই বলা ভুল হবে না, নারীমুক্তির যে আদর্শ

[৫] এখানে চিন্তার অবকাঠামো গঠনের কথা বলা হয়েছে। সাহিত্যকর্ম চুরির অভিযোগ করা হয়নি।

রোকেয়া তার লেখনীতে তুলে ধরেছেন, সে আদর্শের পরিচয় ও শিক্ষা তিনি পশ্চিমা লেখকদের কাছ থেকে লাভ করেন[৬]।

বেগম রোকেয়া দুটি কন্যা সন্তান জন্ম দেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে উভয়েই শৈশবে মৃত্যুবরণ করে। তাই আমৃত্যু নিঃসন্তান হিসেবে জীবনযাপন করেন রোকেয়া। ১৯০৯ সালে তার স্বামী সাখাওয়াত হোসেন মারা যান। পাঁচ মাস পর পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে বিহারের ভাগলপুরে ‘সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন রোকেয়া। পরবর্তীতে ভাগলপুর ছেড়ে ১৯১১ সালে কলকাতায় একই নামে আবার স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। বেগম রোকেয়ার জীবদ্দশায় বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রীর অভাবে স্কুলে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান চালু করা সম্ভব হয়নি। শুরুতে শুধু উর্দু এবং পরবর্তীতে ১৯১৭ সালে ইংরেজি ভাষায় পাঠদান আরম্ভ হয়[৭]। ১৯১৬ সালে তিনি ‘আনজুমানে-খাওয়াতীনে ইসলাম’ নামে নারীদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

মতিচূর ১ম খণ্ড (১৯০৪), ***Sultana's Dream*** (১৯০৮), ***মতিচূর*** ২য় খণ্ড (১৯২২), ***পদ্মরাগ*** (১৯২৪) ও ***অবরোধ-বাসিনী*** (১৯৩১)—এ পাঁচটি বই ছাড়াও অনেক প্রবন্ধ ও অন্যান্য শাখায় লেখালেখি করেছেন বেগম রোকেয়া। যেগুলোর অধিকাংশই তৎকালীন জনপ্রিয় সব পত্রিকায় ছাপা হয়। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর কলকাতায় বেগম রোকেয়া মৃত্যুবরণ করেন।

এই হল বেগম রোকেয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী। এবার **মূল আলোচনা শুরু করা যাক**।

---

[৬] গোলাম মুরশিদ, (১৯৯৩). *নারীপ্রগতির একশো বছর; রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া.* অবসর
[৭] বেগম রোকেয়া, (২০০৬). *রোকেয়া রচনাবলী.* পৃষ্ঠা ৫৪৭. বাংলা একাডেমী

রোকেয়ার স্বরূপ সন্ধানে

বেগম রোকেয়া নারীজাতির উদ্দেশ্যে যা কিছু লিখেছেন, পাঠ্যপুস্তকের বদৌলতে তার অনেক কিছুই সবাই জানেন। তবে রোকেয়ার কথা, কাজ ও বিশ্বাসের একটা বড় অংশ এখনো মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। যেমন—

রোকেয়া বনাম ইসলাম

বেগম রোকেয়া রচিত সর্বপ্রথম প্রবন্ধের নাম '**পিপাসা**'। 'নবপ্রভা' পত্রিকায় ফাল্গুন ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় 'পিপাসা'। কারবালার প্রান্তরে হুসাইন রাঃ-এর সপরিবারে শাহাদাতের হৃদয়বিদারক ঘটনার করুণা মাখা চিত্রায়ন এই রচনাটি। এটি পড়া মাত্রই পাঠকের চোখ অশ্রুতে ভিজে উঠবে। প্রশ্ন জাগবে, কতই না মহীয়সী সে নারী, মুসলিমদের দুঃখের ইতিহাসকে যিনি কলমের কালিতে ফুটিয়ে তুলেছেন নিপুণ দক্ষতায়।

কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ না। রোকেয়া রচিত তুমুল আলোচিত প্রবন্ধ '**অলঙ্কার না badge of slavery**[৮]' ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা থেকে বাছাইকৃত উদ্ধৃতিগুলো আপনার খেদমতে পেশ করছি—

---

[৮] বেগম রোকেয়া, (২০০৬). *রোকেয়া রচনাবলী.* (পৃষ্ঠা ৬০৫-৬১৪). বাংলা একাডেমী

এক

অলঙ্কার না Badge of slavery?[*]

ভগিনীগণ! তোমরা কি কোনদিন আপনার দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যসমাজে আমরা কি, দাসী!! পৃথিবী হইতে দাস-ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? আমরা যে নরাধীন সেই নরাধীন! দিদীমাদের মুখে শুনি যে, নারী নরের অধীন থাকিবে, ইহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত— তিনি প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তাহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত রমণীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু একথার আমার সন্দেহ আছে। কারণ দিদীমাদের এ জ্ঞান পুরুষের নিকট হইতে গৃহীত। তাঁহারা ত বলিবেনই যে, রমণী কেবল পুরুষের সুখ শান্তিদাত্রিরূপে জন্মগ্রহণ করে।

"দিদীমাদের মুখে শুনি যে, **নারী নরের অধীন থাকিবে**, ইহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত— তিনি প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তাহার সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত রমণীর সৃষ্টি হয়। **কিন্তু একথায় আমার সন্দেহ আছে**। কারণ **দিদীমাদের এ জ্ঞান পুরুষদের নিকট হইতে গৃহীত**।"

উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট যে, বেগম রোকেয়া বিশ্বাস করেন না—

পুরুষ সৃষ্টির পর আল্লাহ তাআলা পুরুষের জন্য নারী সৃষ্টি করেছেন। কারণ, তার মতে এই তথ্য পুরুষদের থেকে নেওয়া।

❑ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'আমি যমীনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি'; তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই

তো আপনার প্রশংসামূলক তাসবীহ্ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণা করি’। তিনি বললেন, ‘আমি যা জানি, তোমরা তা জান না’।

এবং তিনি আদাম (আ.)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, ‘এ বস্তুগুলোর নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’।"

(সূরা বাকারা ০২:৩০-৩১)

"তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন আর **তাথেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়**। যখন সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হয় তখন সে লঘু গর্ভধারণ করে আর তা নিয়ে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন ভারী হয়ে যায় তখন উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ডেকে বলে, ‘যদি তুমি আমাদেরকে (গঠন ও স্বভাবে) ভাল সন্তান দান কর তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।"

(সূরা আরাফ ০৭:১৮৯)

মহান আল্লাহ্ তাআলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি প্রথমে আদাম আঃ ও পরে তাঁর শান্তির জন্য নারী (হাওয়া আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহর সে ঘোষণা রোকেয়ার বিশ্বাসের জন্য যথেষ্ট নয়—কেন?

দুই

২১ আমাদিগকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত পুরুষগণ ঐ ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে “ঈশ্বরের আদেশপত্র” বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোন বিশেষ ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয় আমরা আলোচ্য নহে—ধর্ম্মে যে সামাজিক আইনকানুন বিধিবদ্ধ আছে, আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব, সুতরাং ধার্ম্মিকগণ নিশ্চিন্ত থাকুন। পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত কিংবা

পরিশেষ ৬১১

দেবতা বলিয়া প্রকাশ করিয়া অসভ্য বর্ব্বরদিগকে শাসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পয়গম্বরদিগকে (ঈশ্বরপ্রেরিত মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায়!

“আমাদিগকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে “ঈশ্বরের আদেশপত্র” বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। …পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত দূত কিংবা দেবতা বলিয়া প্রকাশ করিয়া অসভ্য বর্বরদিগকে শাসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, **সেইরুপ পয়গম্বরদিগকে** (ঈশ্বরপ্রেরিত মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও **বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায়!**”

‘কেন’-র উত্তর তবে পাওয়া গেলো। যাইহোক, রোকেয়া এখানে দাবি করেছেন—

প্রথমত, নারীদের প্রতারিত করতে পুরুষরা তাওরাত, ইঞ্জিল, কুরআনসহ সকল আসমানি কিতাবকে[৯] আল্লাহর নাযিলকৃত আদেশগ্রন্থ বলে প্রচার করে। আদতে সেগুলো আল্লাহর নাযিলকৃত আসমানি কিতাব নয়।

দ্বিতীয়ত, পয়গম্বর বা নবীরা মহান আল্লাহর প্রেরিত দূত নয়। বরং তারা সবাই ছিল ভণ্ড, প্রতারক, মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার *পুরুষ*। নিজেদের সময়কার অসভ্য বর্বর মানুষদের মধ্যে সবচাইতে চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন তারা। তাই কুটিল বুদ্ধি খাটিয়ে তারা অপেক্ষাকৃত মূর্খ ও বোকাদের মাঝে নিজেদের পয়গম্বর বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন!

বেগম রোকেয়ার দৃষ্টিতে এর প্রমাণ হল—যুগে যুগে মানুষ আগের যুগের মানুষদের চাইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি করেছে। আর যেকোনো সময়ের সবচে চতুর ব্যক্তিরা নিজেদের নবী হিসেবে দাবি করেছে। সেজন্য দেখা গেছে, পরবর্তী পয়গম্বর বা নবীগণ আগের যুগের নবী-রাসূলগণ থেকে বেশি বুদ্ধিমান[১০] (নাউযুবিল্লাহ)।

❑ নবী-রাসূল প্রেরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

“প্রত্যেক জাতির জন্য (পাঠানো হয়েছে) একজন রসূল। তাদের রসূল যখন এসেছে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে তাদের মাঝে ফায়সালা করা হয়েছে। তাদের প্রতি কোনো যুলম করা হয়নি।”

(সূরা ইউনুস ১০:৪৭)

---

৯ *‘ধর্মগ্রন্থগুলিকে’*

১০ উদাহরণস্বরূপ—ইসলামের নবী ইবরাহীম আঃ, ঈসা আঃ ও রাসূলুল্লাহ সাঃ। রোকেয়ার দাবি, সমসাময়িক আপডেটেড তথ্য কাজে লাগিয়ে তারা প্রত্যেকে নিজেদের সময়কার মানুষদেরকে প্রতারিত করেছেন। রোকেয়ার দ্বিতীয় দাবি অনুযায়ী, যেহেতু ইবরাহিম আঃ-এর আগমন হয় ঈসা আঃ ও রাসূল সাঃ-এর বহু যুগ পূর্বে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইবরাহিম-এর সময়ের মানুষদের চেয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরবর্তী যুগের ঈসা আঃ, মুহাম্মাদ সাঃ-এর সময়ের মানুষদের দখল ছিল বেশি। আর তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইবরাহিম আঃ-এর তুলনায় ঈসা আঃ, এবং তাঁর তুলনায় মুহাম্মাদ সাঃ-এর দখল বেশি। এভাবে তারা ‘প্রতারণা’ করেছেন নারীদের, শাসন করেছেন *‘অসভ্য বর্বর’* সাহাবীদের।

আসমানি কিতাব সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

“তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোনো কল্যাণ নেই বরং **কল্যাণ আছে এতে যে, কোনো ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ্,** শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, **কিতাবসমূহ ও নাবীগণের প্রতি** এবং আল্লাহ্র ভালবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও যাচ্ঞাকারীদের এবং দাসত্বজীবন হতে নিস্কৃতি দিতে দান করবে এবং নামায কায়িম করবে ও যাকাত দিতে থাকবে, ওয়া‘দা করার পর স্বীয় ওয়া‘দা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংকটে ধৈর্য ধারণ করবে, এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ আর এ লোকেরাই মুত্তাকী।”

(সূরা বাকারা ০২:১৭৭)

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন,

“তোমরা বল, ‘আমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা ইবরাহীম ও ইসমাঈল এবং ইসহাক ও ইয়াকূব ও বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা মূসা ও ‘ঈসাকে দেয়া হয়েছে আর যা অন্যান্য নাবীগণকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে দেয়া হয়েছে (এ সবের প্রতিও ঈমান এনেছি), আমরা এদের মধ্য হতে কোনো একজনের ব্যাপারেও কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পিত’।”

(সূরা বাকারা ০২:১৩৬)

এরকম বহু আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সত্যায়ন করেছেন পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলদের, আসমানি কিতাবসমূহের। কিন্তু তাঁদের সবাইকে, সকল ঐশী কিতাবকে সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন বেগম রোকেয়া।

তিন

> ২৩ ক্রমে জগতের বুদ্ধি বেশী হওয়ায় সুচতুর প্রতিভাশালী পুরুষ দেখিলেন যে, “পয়গম্বর” বলিলে আর লোকে বিশ্বাস করে না। তখন মহাত্মা ঈশা আপনাকে দেবতার অংশবিশেষ (ঈশ্বরপুত্র !) বলিয়া পরিচিত করিয়া ইঞ্জিল গ্রন্থ রচনা করিলেন। তাহাতে লেখা হইল, “নারী পুরুষের সম্পূর্ণ অধীনা—নারীর সম্পত্তিতে স্বামী সম্পূর্ণ অধিকারা।” আর বুদ্ধি-বিবেকহীনা নারী তাই মানিয়া লইল।

মুসলিমদের ভালোবাসার রাসূল, মুহাম্মাদ সাঃ-এর আগমনের সুসংবাদ দানকারী, পবিত্র কুমারী মাতার সন্তান ঈসা ইবনে মারইয়াম আঃ সম্পর্কে বেগম রোকেয়া বলেন,

“ক্রমে জগতের বুদ্ধি বেশি হওয়ায় সুচতুর প্রতিভাশালী পুরুষ দেখিলেন যে, “পয়গম্বর” বলিলে আর লোকে বিশ্বাস করে না। তখন **মহাত্মা ঈশা আপনাকে অবতারের অংশবিশেষ** (ঈশ্বরপুত্র!) **বলিয়া পরিচিত করিয়া ইঞ্জিল গ্রন্থ রচনা করিলেন**[১১]। তাহাতে লেখা হইল, “নারী পুরুষের সম্পূর্ণ অধীনা—নারীর সম্পত্তিতে স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার।” আর **বুদ্ধি-বিবেকহীনা নারী তাই মানিয়া লইল**।”

রোকেয়া এখানে ঘোষণা করলেন, ধোঁকা খেতে খেতে একটা সময় পর মানুষের হুশ ফিরল। ‘প্রতারক’ নবী-রাসূলগণ নিজেদের আল্লাহ প্রেরিত পুরুষ বললে তখন আর কেউ বিশ্বাস করলো না। তাই সন্দেহপ্রবণ মানুষদের বিশ্বাস অর্জন করতে ভিন্ন পথ ধরলেন সুচতুর ঈসা আঃ। নিজের মর্যাদা আরও এক ধাপ বাড়িয়ে তিনি সরাসরি আল্লাহর অংশ বলে দাবি করলেন নিজেকে। ‘রচনা’ করলেন ইনজিল।

---

[১১] কেউ যেন ভুল ভেবে না বসেন যে, রোকেয়া এখানে *ইনজিল* বলতে বিকৃত বাইবেলকে বুঝিয়েছেন। রোকেয়া যে এখানে প্রকৃত ইনজিলকেই নির্দেশ করেছেন আগের ও পরের অনুচ্ছেদগুলোতে তা স্পষ্ট।

রোকেয়ার দাবি, ইনজিল রচনা করার সময় ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিলেন ঈসা আঃ, রাখলেন নারীদের উপর জুলুমকারী বিধান। আর ঈসা আঃ-এর অনুগত বুদ্ধি বিবেকহীনা নারীরা সেসবই মেনে নিলেন (নাউযুবিল্লাহ)।

❑ মুসলিমদের কাছে অত্যন্ত প্রশংসিত ও সম্মানিত রাসূল ঈসা আঃ। পবিত্র কুরআনে অনেকবার তাঁর রিসালাতের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, সমুন্নত করা হয়েছে তাঁর মর্যাদা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"এবং নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে ক্রমান্বয়ে রসূলদেরকে প্রেরণ করেছি, মারইয়াম পুত্র **ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি** এবং 'পবিত্র আত্মা' যোগে (জিবরাঈলের মাধ্যমে) তাকে শক্তিশালী করেছি, অতঃপর যখনই কোনো রসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনোঃপুত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ এবং কিছু সংখ্যককে অস্বীকার করেছ এবং কিছু সংখ্যককে হত্যা করেছ।"

(সূরা আল বাকারাহ ০২:৮৭)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

"বল, 'আমরা আল্লাহর উপর এবং আমাদের প্রতি ও ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরের প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নাবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছি; আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পিত।"

(সূরা আলে-ইমরান ০৩:৮৪)

কিন্তু রোকেয়া এসব কিছুই অস্বীকার করেন।

চার

> ২৪ তারপর মহাত্মা মহম্মদ আইন প্রস্তুত করিলেন যে, "রমণী সর্ব্বদাই নরের অধীনা থাকিবে, বিবাহের পূর্ব্বে পিতা কিংবা ভ্রাতার অধীনা, বিবাহের পর স্বামীর অধীনা, স্বামী অভাবে পুত্রের অধীনা থাকিবে।" আর মূর্খ নারী নত মস্তকে ঐ বিধান মানিয়া লইল।

"তারপর মহাত্মা **মহম্মদ আইন প্রস্তুত করিলেন** যে, "রমণী সর্ব্বদাই নরের অধীনা থাকিবে, বিবাহের পূর্বে পিতা কিংবা ভ্রাতার অধীনা, বিবাহের পর স্বামীর অধীনা, স্বামী অভাবে পুত্রের অধীনা থাকিবে।" আর **মূর্খ নারী নত মস্তকে ঐ বিধান মানিয়া লইল**।"

এ পর্যায়ে রোকেয়া নবীজি সাঃ-কে প্রতারক দাবি করে বলেন, স্বয়ং রাসূল সাঃ-ও অন্যায় বিধান বানিয়েছেন। আর চাপিয়ে দিয়েছেন সমকালীন *মূর্খ নারী* সাহাবীগণের উপর।

রোকেয়ার এই অনুচ্ছেদের সারাংশ দাঁড়ায়—

- পবিত্র কুরআন এবং মুহাম্মাদ সাঃ-এর হাদিস ও সুন্নাহ বানোয়াট। আল্লাহর সঙ্গে সেসবের কোনো সম্পর্ক নেই।
- মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর প্রেরিত নবী ছিলেন না।
- যেহেতু মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর প্রেরিত কেউ নন, বস্তুত তিনি একজন ভণ্ড, প্রতারক ও মিথ্যুক।

- উম্মাহাতুল মুমিনীন[১২] সহ নারী সাহাবীগণ সকলেই ছিলেন মূর্খ। নতুবা তারা মুহাম্মাদ সাঃ-এর বানোয়াট বিধান বিনা বাক্যে মেনে নিতেন না[১৩]।

❑ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে রাসূল সাঃ, কুরআন ও হাদিসের সত্যতা সম্পর্কে অজস্র আয়াত নাযিল করেছেন। সেসব থেকে অল্প কিছু আয়াত দেখা যাক—

"আমি তোমাকে সত্যদ্বীনসহ সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি, জাহান্নামীদের সম্বন্ধে তোমাকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না।"

(সূরা বাকারা ০২:১১৯)

"আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"

(সূরা সাবা ৩৪:২৮)

"যে রসূলের আনুগত্য করল, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল, কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে (জোরপূর্বক তাকে সৎপথে আনার জন্য) আমি তোমাকে তাদের প্রতি পাহারাদার করে পাঠাইনি।"

(সূরা নিসা ০৪:৮০)

"এটা ঐ (মহান) কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ।"

(সূরা বাকারা ০২:০২)

[১২] রাসূল সাঃ-এর সম্মানিত স্ত্রী-গণ।
[১৩] নাউযুবিল্লাহ।

এছাড়াও বহু আয়াত রয়েছে, যেখানে রাসূল সাঃ ও কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন।

❑ রাসূলের (সাঃ) এর শেখানো শরিয়াহ ও বিধানের ব্যাপারে মুমিনদের আচরণ কেমন হবে, আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কেও সতর্ক করে বলেন,

"মু'মিনদেরকে যখন তাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন মু'মিনদের জওয়াব তো এই হয় যে, তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম, আর তারাই সফলকাম।"

(সূরা আন-নূর ২৪:৫১)

অর্থাৎ মুমিনদের কর্তব্য হল রাসূলের নির্দেশ শোনামাত্র এ কথা বলা ও বিশ্বাস করা যে, "**আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম**"। তাতে সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই। আর তারাই সফল, যারা তাঁর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে।

❑ **নারীরা সবসময় পুরুষদের নিরাপত্তার চাঁদরে সুরক্ষিত থাকবেন**—এ ফয়সালা মাটির পৃথিবীতে নয়, আসমান থেকে হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"**পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল** এ কারণে যে, **আল্লাহ তাদের একে অন্যের উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন**, আর এজন্য যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে। ফলে **পুণ্যবান স্ত্রীরা** (আল্লাহ ও স্বামীর প্রতি) **অনুগতা থাকে** এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে তারা তা (অর্থাৎ তাদের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ) সংরক্ষণ করে যা আল্লাহ সংরক্ষণ করতে আদেশ দিয়েছেন...।"

(সূরা নিসা ০৪:৩৪)

অর্থাৎ **পুরুষরা নারীদের উপর কতৃত্বশীল, এটা আল্লাহ তাআলারই বিধান।** আর **পুরুষ ও নারী—উভয়ের উপর কতৃত্বশীল একজন। তিনি আমাদের রব, মহান আল্লাহ তাআলা।** কিন্তু রোকেয়া এগুলোও অস্বীকার করলেন।

পাঁচ

২৫ ভগিনি, তোমরা দেখিতেছ এই ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি পুরুষরচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পাও, কোন স্ত্রী মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতে। ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বরপ্রেরিত বা ঈশ্বরাদিষ্ট নহে। যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণীশাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত কেবল এসিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত যাইয়া "রমণীজাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে" ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এসিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকার কি তাঁহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বরদত্ত জল বায়ু ত সকল দেশেই আছে—কেবল দূতগণ সর্ব্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন? যে কথা পুরাকালে অসভ্য বর্ব্বরগণ বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান কালের সুসভ্যগণ যদি বিশ্বাস করেন, তবে সভ্যতায় ও অসভ্যতায় প্রভেদ কি? যাহা হউক এখন আমরা আর ধর্ম্মের নামে নতমস্তকে নরের প্রভুত্ব সহিব না। আরও দেখ যেখানে ধর্ম্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। প্রমাণ—সতীদাহ। যেখানে ধর্ম্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনা অর্থাৎ পুরুষের সমতুল্যা। এস্থলে ধর্ম্ম অর্থে ধর্ম্মের সামাজিক বিধান বুঝাইতেছে।

ভগিনি, তোমরা দেখিতেছ **এই ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি পুরুষরচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে**। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পাও, কোনো স্ত্রী মুনির বিধানে হয়তো তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতে। **ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বরপ্রেরিত বা ঈশ্বরদিষ্ট নহে।** যদি **ঈশ্বর কোনো দূত রমণীশাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত কেবল এসিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না।** দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া "রমণীজাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে" ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এসিয়ারই ঈশ্বর? আমেরিকার কি তাঁহার রাজত্ব ছিল না? ঈশ্বরদত্ত জল বায়ু ত সকল দেশেই আছে—কেবল দূতগণ সর্ব্বদেশময় ব্যাপ্ত হন নাই কেন? **যে কথা পুরাকালে অসভ্য বর্বরগণ বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান কালের সুসভ্যগণ যদি বিশ্বাস করেন, তবে সভ্যতায় ও অসভ্যতায় প্রভেদ কি?** যাহা

হউক এখন আমরা আর ধর্ম্মের নামে নতমস্তকে নরের প্রভুত্ব সহিব না। আরও দেখ **যেখানে ধর্ম্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেইখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক**...**যেখানে ধর্ম্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনা অর্থাৎ পুরুষের সমতুল্যা**।

বেগম রোকেয়ার এই দাবিগুলোর সারমর্ম হল—

- **[ক]** কুরআন সহ কোনো *ধর্ম্মগ্রন্থ*-ই আল্লাহ প্রেরিত নয়। এগুলো নিজেদেরকে নবী-রাসূল দাবি করা সুচতুর মানুষদের তৈরি।
- **[খ]** *ধর্মশাস্ত্র* অর্থাৎ শরিয়াহ আইন[১৪]-ও সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহ প্রেরিত বিধান নয়, বরং পুরুষদের বানানো।
- **[গ]** মুহাম্মাদ সাঃ এবং পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ যদি নারী হতেন, তাহলে ইসলামের বিধি-বিধান ভিন্ন হতো। কারণ, পুরুষ হওয়ায় নবী-রাসূলগণ নারীদের প্রতারিত করে বিধান তৈরি করেছেন।
- **[ঘ]** আল্লাহ তাআলা যদি সত্যিই নবী-রাসূল প্রেরণ করতেন, তাহলে শুধু এশিয়ায় পাঠাতেন না। ইউরোপ আমেরিকায়ও তাঁর দ্বীন প্রচারের জন্য নবী-রাসূল পাঠাতেন।
- **[ঙ]** সকল নবী-রাসূলগণের উম্মতগণ-ই ছিলেন *অসভ্য বর্বর*[১৫]। তাই নবী-রাসূলগণের বানোয়াট দাবিসমূহ বিশ্বাস করেছেন। আজকের *সুসভ্য* মানুষেরা সেগুলো বিশ্বাস করলে সভ্যতা আর অসভ্যতার পার্থক্য কোথায় থাকলো?

---

[১৪] এবং অন্য ধর্মের বিধানগুলো

[১৫] এখানে যেন কেউ এই ভুল সিদ্ধান্তে না আসেন যে, বেগম রোকেয়া বলতে চেয়েছেন, ইসলাম গ্রহণের আগে তারা অসভ্য, বর্বর ছিল। বরং তিনি বলেছেন, অসভ্য, বর্বর ছিল বলেই তারা সকল নবী-রাসূলদের দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করেছেন। সভ্য, আধুনিক হলে তারা নারী নির্যাতনকারী পুরুষদের এসব কথা বিশ্বাস করার মতো 'ভুল' করতো না তারা।

- [চ] ধর্ম হল নারী নির্যাতনের রাস্তা। যেখানে ধর্মের প্রভাব শক্ত, নারী সেখানে অধিক অত্যাচারিত হয়। আর ধর্মহীন অঞ্চলে নারী পুরুষের সমান অধিকার ও স্বাধীনতা উপভোগ করে[১৬]।
- [ছ] সবশেষে রোকেয়া সিদ্ধান্তে আসেন, ধর্মের নামে পুরুষের কতৃত্ব তিনি আর সহ্য করবেন না।

তার এই দাবিগুলোর যথার্থতা কতটুকু?

কুরআন আল্লাহর বাণী

রোকেয়ার দাবি, কুরআন-সহ কোনো ধর্মগ্রন্থই আল্লাহ তাআলা নাযিল করেননি। আসলেই কি তাই?

❑ কুরআনের সত্যতা আল্লাহ তাআলা অসংখ্যবার নিশ্চিত করেছেন। সেই সাথে যারা কুরআনকে মানুষের রচনা বলে অপপ্রচার চালায়, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন এর মতো একটি সূরা রচনা করে আনতে[১৭]। যদিও আজ পর্যন্ত কোনো কাফির, মুশরিক বা মুরতাদ তাতে সফলতা পায়নি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[১৬] নাউযুবিল্লাহ।

[১৭] শুধু এটিই নয়। আল্লাহ কুরআনে কাফিরদের প্রতি ধারাবাহিক চ্যালেঞ্জ দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "বল, 'এ কুরআনের মত একখানা কুরআন আনার জন্য যদি সমগ্র মানব আর জ্বীন একত্রিত হয় তবুও তারা তার মত আনতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে।'"

(সূরা বনি ইসরাইল ১৭:৮৮)

কাফিররা এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে না পারায় আল্লাহ তাআলা আরেকটু সহজ করে বললেন,

> "তারা কি বলে 'সে [অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাঃ)] ওটা রচনা করেছে?' বল, 'তাহলে তোমরা এর মত দশটি সূরাহ রচনা করে আনো, আর (এ কাজে সাহায্য করার জন্য) আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে ডাকতে পার ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়েই থাক।"

(সূরা হুদ ১১:১৩)

মজার ব্যাপার হল, আরবের কাফির-মুশরিকরা এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলাও করতে পারেনি। তারপর আল্লাহ তাআলা আরও একটু সহজ করে বলেন,

"আমি আমার বান্দাহর প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মত কোনো সূরাহ এনে দাও আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর। যদি তোমরা না পার এবং কক্ষনো পারবেও না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত রয়েছে কাফেরদের জন্য।"

(সূরা বাকারা ০২:২৩-২৪)

শরীয়াহ আইন আল্লাহর

❑ শরিয়াহ আইন কি পুরুষদের বানানো আইন? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

*তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই **বিধি-ব্যবস্থাই** দিয়েছেন যার হুকুম তিনি দিয়েছিলেন নূহকে। আর সেই **(বিধি ব্যবস্থাই)** তোমাকে ওহীর মাধ্যমে দিলাম যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে..."*

(সূরা আশ-শূরা ৪২:১৩)

*কাজেই মানুষদের মধ্যে বিচার ফায়সালা কর **আল্লাহ যা নাযিল করেছেন** তদনুসারে, আর **তোমার কাছে যে সত্যবিধান এসেছে** তা ছেড়ে দিয়ে তাদের*

"তারা কি এ কথা বলে যে, সে [অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাঃ)] এটা রচনা করেছে? বল, তাহলে তোমরাও এর মত একটা সূরাহ (রচনা করে) নিয়ে এসো আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে পার তাকে ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক [যে মুহাম্মাদ (সাঃ)-ই তা রচনা করেছেন]।"

(সূরা ইউনুস ১০:৩৮)

অনুমিতভাবেই, এই চ্যালেঞ্জও কোনো কাফির গ্রহণ করেনি। অথচ রাসূল সাঃ-এর সময়ে কুরাইশ, ইহুদীদের মাঝে আরবি ভাষা, কবিতা ও সাহিত্যে দক্ষ অসংখ্য ব্যক্তি ছিল। আজো লক্ষ লক্ষ ইসলামবিদ্বেষী আরবি ভাষায় সুগভীর পাণ্ডিত্য রাখেন। তবুও, গত চৌদ্দশো বছরে একজন মানুষও এই চ্যালেঞ্জে সফল হতে পারেনি। কেন পারেননি? বুদ্ধিমানদের জন্য কি এতে নিদর্শন নেই?

*খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি **শরীয়াত** ও একটি কর্মপথ নির্ধারণ করেছি।...”*

(সূরা আল-মায়েদা ০৫:৪৮)

নবীজি সাঃ কোনো বিধান অনুসরণ করেছেন? আল্লাহ তাআলা বলেন,

*“তারপর আমি তোমাকে **দীনের এক বিশেষ বিধানের** উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। **সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর** এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল- খুশীর অনুসরণ করো না।”*[১৮]

(সূরা আল-জাসিয়া ৪৫:১৮)

আল্লাহ তাআলার দেখানো সে পথেই বিচার করেছেন রাসূল সাঃ। তাঁর সুন্নাহ-ও শরিয়াহর একটি উৎস। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

*“**রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও** এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।”*

(সূরা আল-হাশর ৫৯:৭)

আর রাসূল সাঃ বিদায় হজে বলে গেছেন,

*“আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের মাঝে **দুটি জিনিস** রেখে যাচ্ছি, **যা অবলম্বন করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না।** তা হল **আল্লাহর কিতাব** এবং **আমার সুন্নাহ**। ’হওয’ (কাওসারে) আমার নিকট অবতরণ না করা পর্যন্ত তা বিচ্ছিন্ন হবে না।”*

---

[১৮] তাফসীরে আহসানুল বায়ানে বলা হয়েছে, শরীয়ত বলতে এখানে সেই দ্বীনের বিধানকে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।

(হাকেম ৩১৯)

বক্তব্য সুস্পষ্ট। শরিয়াহ আইন আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ তাআলারই আইন, কোনো পুরুষ বা মানবরচিত নয়।

পুরুষ নবী-রাসূল প্রেরণের কারণ

❑ নবী-রাসূলগণ সবাই কেন পুরুষ? কোনো নারীর উপর কেন কুরআন নাযিল হল না? কারণ, **নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করবেন মনোনীত পুরুষগণ**—এ সিদ্ধান্ত স্বয়ং আল্লাহ তাআলার,

"আর আমি তোমার পূর্বে জনপদবাসী থেকে পুরুষদেরকেই কেবল রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাদের উপর আমি ওহী নাযিল করতাম।..."

(সূরা ইউসুফ ১২:১০৯)

"আর আমি তোমার পূর্বে জনপদবাসী থেকে **পুরুষদেরকেই কেবল রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি**, যাদের উপর আমি ওহী নাযিল করতাম।"

(সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৭)

আল্লাহর বিধি-বিধান প্রচার করতে গিয়ে তাঁদের অসংখ্য বাঁধা-বিপত্তির মুখোমুখি হওয়া লাগতো। অবিশ্বাসীদের সৃষ্ট প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হতো। কখনো কখনো যুদ্ধও করতে হতো।

কোমল হৃদয়ের অধিকারী নারীজাতি স্বভাবগতভাবে সেসব কষ্ট, বাঁধা সহ্য করার উপযুক্ত নন। আল্লাহ তাআলা তাদের সেভাবে সৃষ্টি করেননি। তাদের আছে মাসিক, গর্ভধারণ, মাতৃত্ব-র মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব; জীবনের বড় একটা সময় ধরে যেগুলো তাদের শরীর ও মন দখল করে রাখে। তাই তিনি

নবুওয়াত ও নেতৃত্বের মতো কঠিন দায়িত্বগুলো পুরুষদের জন্য বরাদ্দ করেছেন[১৯]।

বস্তুত, নবুওয়াত ও রিসালাত কোনো সুখ-ভোগের অধিকার নয়। বরং বিশাল এক গুরুদায়িত্ব। ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া মানব জাতিকে বারবার তাওহীদের দিকে ডাকা যে কতটা কঠোর দায়িত্ব, তা কুরআনে বিভিন্ন নবীর লড়াই সংগ্রামের ঘটনায় আমরা জেনেছি। এই কঠিনতম দায়িত্ব নিজের কাঁধে চাপিয়ে পুরুষগণ নারীদের উপর লিঙ্গবিদ্বেষ ও লিঙ্গবৈষম্য চর্চা করেছেন— এমনটা ভাবা হাস্যকর।

তাছাড়া, রাসূল সাঃ কিংবা তাঁর পূর্ববর্তী কোনো নবী কিংবা রাসূলই নিজেদের ইচ্ছেমতো আইন তৈরি করতে পারেননি। আল্লাহ তাদেরকে যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন, তারা সেভাবেই মানুষের জন্য ইসলামের বিধি-বিধান ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা ছিল না।

এর অন্যতম প্রমাণ হল, আমাদের রাসূল সাঃ ছিলেন উম্মী নবী। যিনি লিখতে পড়তে জানতেন না। তারপরও তিনি এমন এক কিতাবকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, যা কোনো মানুষের লেখা হতে পারে না।

নবী-রাসূলগণ কি শুধু এশিয়াতেই এসেছেন?

পূর্ববর্তী সকল নবী ও রাসূলদের ভণ্ড বলার পিছনে রোকেয়ার যুক্তি, মহান আল্লাহ তাআলা যদি সত্যিই নবী-রাসূল পৃথিবীতে পাঠাতেন, তাহলে তারা কেবল এশিয়াতে সীমাবদ্ধ থাকতেন না।

---

[১৯] এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুনঃ
Islam Q&A. (২০১২, July ২৭). *Why were there no female Prophets or Messengers?* https://islamqa.info/en/answers/১৫৮০৪৪/why-were-there-no-female-prophets-or-messengers?

রোকেয়ার এই দাবিটি সত্যি নয়[২০]। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক জাতির কাছেই নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

***প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি** (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর 'ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের মধ্যে কতককে সৎপথ দেখিয়েছেন, আর কতকের উপর অবধারিত হয়েছে গুমরাহী, অতএব যমীনে ভ্রমণ করে দেখ, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কী ঘটেছিল!"*

(সূরা আন-নাহ্‌ল ১৬:৩৬)

"**প্রত্যেক জাতির জন্য (পাঠানো হয়েছে) একজন রসূল।** তাদের রসূল যখন এসেছে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে তাদের মাঝে ফায়সালা করা হয়েছে। তাদের প্রতি কোনো যুলম করা হয়নি।"

(সূরা ইউনুস ১০:৪৭)

সাহাবীদের মর্যাদা

বেগম রোকেয়া আরও মন্তব্য করেন, ***অসভ্য বর্বর* বলেই প্রত্যেক নবী-রাসূলদের উপর প্রেরিত আসমানি কিতাব ও বিধানকে তাঁদের স্ব স্ব সাহাবীগণ মেনে নিয়েছেন। এখনকার *সুসভ্য* মানুষদের পক্ষে যা শোভনীয় নয়।**

অর্থাৎ রোকেয়ার দাবি, আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী রাঃ সহ মুসলমানদের শ্রদ্ধেয় সকল পুরুষ সাহাবীগণ, এবং অন্যদিকে খাদিজা রাঃ,

[২০] আরও বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে জানতে পড়ুন *'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ৩'* বইয়ের প্রথম অধ্যায় '**শুধু মিডল ইস্টের কাহিনী কেন?**'

আয়েশা রাঃ, ফাতিমা রাঃ, উম্মাহাতুল মুমিনীনসহ সকল নারী সাহাবীগণ অসভ্য, বর্বর!

শুধু রাসূল সাঃ-ই নয়। বরং সকল নবী-রাসূলগণের সম্মানিত সাহাবী-অনুসারীগণই অসভ্য, বর্বর। নতুবা নারী নির্যাতনকারী নবী-রাসূল সাজা ভণ্ড 'পুরুষ'দের তারা অনুসরণ করবেন কেন!

তার মতে, আধুনিক সময়ে এসে (ইউরোপীয়) সভ্যতার ছোঁয়া পাওয়া মানুষেরা সেসব বিশ্বাস করলে সভ্যতা আর অসভ্যতার পার্থক্য কোথায়?

এরপর তিনি ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় দাবি করেন, যেখানেই ধর্মের বন্ধন দৃঢ়[২১] সেখানেই নারীদের প্রতি নির্যাতন বেশি হয়। আর যে অঞ্চলে ধর্মবন্ধন শিথিল[২২] সেখানে নারীরা ধর্মীয় অঞ্চলের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে। যদিও সে দাবির পক্ষে কোন প্রমাণ তিনি দেননি।

ছয়

> ১৯ দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই, তাহার প্রধান কারণ এই যে, যখনই কোনো ভগিনী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি ধর্ম্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে! আমরা প্রথমতঃ যাহা সহজে মানি নাই, তাহা পরে ধর্ম্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছি। এখন ত অবস্থা এই যে, ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই শুনিতে পাই, "প্যাট্! তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাক্‌বি গোলাম!" সুতরাং আমাদের আত্মা পর্য্যন্ত গোলাম হইয়াছে।

শরিয়াহ তথা দ্বীনের বিধানের ব্যাপারে রোকেয়া বলেন,

---

[২১] খুব সম্ভবত ভারতের মতো মুসলিম শাসিত অঞ্চলকে ইঙ্গিত করেছেন।
[২২] খুব সম্ভবত ইউরোপ-আমেরিকাকে ইঙ্গিত করেছেন।

"যখনই কোনো ভগিনী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, অমনি **ধর্ম্মের দোহাই** বা **শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে** তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে।"

> ২০ শিশুকে মাতা বলপূর্ব্বক ঘুম পাড়াইতে বসিলে, ঘুম না পাওয়ায় শিশু যখন মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দেখে, তখনই মাতা বলেন "ঘুমা শিগ্‌গির ঘুমা! ঐ দেখ জুজু!" ঘুম না পাইলেও শিশু অন্ততঃ চোখ বুঝিয়া পড়িয়া থাকে। সেই রূপ আমরা যখনই উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে "ঘুমাও, ঘুমাও, ঐ দেখ নরক!" মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্ততঃ মুখে কিছু না বলিয়া আমরা নীরব থাকি। (ক্রমশঃ)

বেগম রোকেয়া দাবি করেন, নারীরা উন্নতি করতে চাইলে সমাজ ধর্মের দোহাই বা শরিয়াহ আইন দেখিয়ে তাদের দমন করে। আর বলে, এমন আচরণ 'নরক' তথা জাহান্নামে নিয়ে যাবে। নরকের এসব 'জুজুবুড়ী' মার্কা গল্প রোকেয়া বিশ্বাস না করলেও তা প্রকাশ করেন না।

"ধর্মশাস্ত্র" তথা শরিয়াহ বিধানগুলো আল্লাহর প্রেরিত আইন নয়, বরং পুরুষের বানানো আইন—রোকেয়ার এই দাবিটি ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে।

ইসলামে শরিয়াহ আইনের আবশ্যকতা ও মর্যাদা ইতোমধ্যেই পাঁচ নং পয়েন্টে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাই এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করলাম না।

সাত

> ২০ শিশুকে মাতা বলপূর্ব্বক ঘুম পাড়াইতে বসিলে, ঘুম না পাওয়ায় শিশু যখন মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দেখে, তখনই মাতা বলেন "ঘুমা শিগ্‌গির ঘুমা! ঐ দেখ জুজু!" ঘুম না পাইলেও শিশু অন্ততঃ চোখ বুঝিয়া পড়িয়া থাকে। সেই রূপ আমরা যখনই উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে "ঘুমাও, ঘুমাও, ঐ দেখ নরক!" মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্ততঃ মুখে কিছু না বলিয়া আমরা নীরব থাকি। (ক্রমশঃ)

‘শিশুকে মাতা বলপূর্বক ঘুম পাড়াইতে বসিলে, ঘুম না পাওয়ায় শিশু যখন মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দেখে, তখনই মাতা বলেন, “ঘুমা শিগগির ঘুমা! ঐ দেখ জুজু!” ঘুম না পাইলেও শিশু অন্ততঃ চোখ বুঝিয়া পড়িয়া থাকে। সেই রূপ আমরা যখন উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে, “ঘুমাও ঘুমাও ঐ দেখ **নরক!” মনে বিশ্বাস না হইলেও** অন্তত আমরা মুখে কিছু না বলিয়া নীরব থাকি।’

ধর্ম যেহেতু নারীদেরকে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে বাঁধা দেয়, তাই সমাজ ও ধর্মের ‘আবিষ্কৃত’ নরকে বেগম রোকেয়া বিশ্বাস করেন না। নরক অর্থাৎ জাহান্নাম তার কাছে কাল্পনিক গালগল্প।

❑ জান্নাত, জাহান্নাম[২৩], কেয়ামত, হাশর—সর্বোপরি ‘আখিরাত’ ঈমানের মৌলিক রূকনের অন্তর্ভুক্ত। আখিরাতের উপর বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম শর্ত।

পবিত্র কুরআনে ঈমানের মৌলিক রূকন সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

হে মুমিনগণ, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং ***শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে।***

(সূরা নিসা ০৪:১৩৬)

বেগম রোকেয়ার মত যারা কুরআনের বাণী অস্বীকার করে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের অস্তিত্ব সত্যায়ন করে বলেন,

---

[২৩] সূরা নাবা (৭৮:২১-২৫)

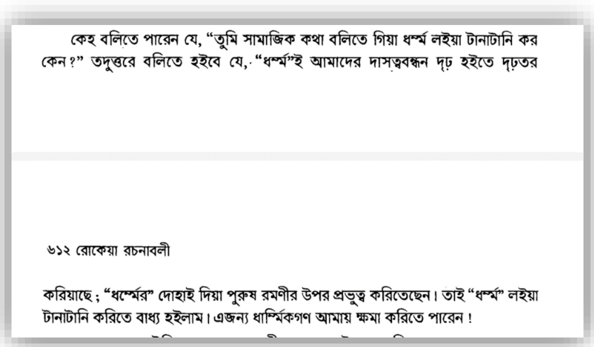
আর যারা কুফরী করবে ও আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে, তারাই **জাহান্নামী**; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(সূরা বাকারা ০২:৩৯)

এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা মিথ্যা মনে করত। *তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে।*

(সূরা আর রহমান ৫৫:৪২-৪৩)

আট



কেহ বলিতে পারেন যে, "তুমি সামাজিক কথা বলিতে গিয়া ধর্ম্ম লইয়া টানাটানি কর কেন?" তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, "ধর্ম্ম"ই আমাদের দাসত্ববন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর

৬১২ রোকেয়া রচনাবলী

করিয়াছে; "ধর্ম্মের" দোহাই দিয়া পুরুষ রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। তাই "ধর্ম্ম" লইয়া টানাটানি করিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য ধার্ম্মিকগণ আমায় ক্ষমা করিতে পারেন!

"কেহ বলিতে পারেন যে, 'তুমি সামাজিক কথা বলিতে গিয়া ধর্ম্ম লইয়া টানাটানি কর কেন?' তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, **'ধর্ম্ম'ই আমাদের দাসত্ববন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে; 'ধর্ম্মের' দোহাই দিয়া পুরুষ রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন**। তাই 'ধর্ম্ম' লইয়া টানাটানি করিতে বাধ্য হইলাম। এজন্য ধার্ম্মিকগণ আমায় ক্ষমা করিতে পারেন!"

রোকেয়া দাবি করেন যে, ধর্মই নারী জাতিকে দাস করে রেখেছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে পুরুষরা নারীর উপর কতৃত্ব করছে। তাই, ধর্মের শিকল থেকে স্বাধীনতা অর্জন ব্যতীত নারীজাতির মুক্তির বিকল্প কোনো উপায় নেই।

নয়

'**অলংকার না badge of slavery**' প্রবন্ধটি ঈষৎ পরিমার্জন করে **'আমাদের অবনতি'** শিরোনামে মাসিক '**নবনূর**' পত্রিকায় ভাদ্র ১৩১১ বঙ্গাব্দে আবারও প্রকাশ করেন রোকেয়া। প্রায় দেড় বছর পর প্রকাশিত সেই প্রবন্ধেও বেগম রোকেয়া নবী-রাসূলগণ ও আসমানি কিতাবসমূহের, শরীয়াহ আইনকে অস্বীকার ও অপবাদ দেওয়ার পুনরাবৃত্তি করেন[২৪]।

দশ

শুধু '**অলংকার না badge of slavery**' বা **'আমাদের অবনতি'**-ই না। রোকেয়ার লেখনীতে এই শ্রেণীর দাবির উপস্থিতি ভূরি ভূরি। ১৩১১ বঙ্গাব্দের মাসিক **'নবনূর'** পত্রিকায় আশ্বিনে প্রকাশিত **'অর্ধাঙ্গী'** নামে প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া স্বভাবসুলভ বিদ্রূপাত্মক ভাষায় বলেন,

> *"এখন মুসলমান সমাজে প্রবেশ করা যাউক। মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের "অর্দ্ধেক", অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্য। অথবা দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র*

[২৪] বেগম রোকেয়া, (২০০৬). *রোকেয়া রচনাবলী.* (পৃ-৫৯৩-৫৯৪). বাংলা একাডেমী

*হইলে আমরা "আড়াই জন" হই!...আপনারা "**মুহম্মদীয় আইনে**" দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে[২৫]।"*

স্পষ্টই এখানে ইসলামে মীরাসের বিধান[২৬] নিয়ে কটাক্ষ করেছেন বেগম রোকেয়া। নারীকে অপূর্ণাঙ্গ দাবি করা 'অন্যায্য' এ 'মুহম্মদীয় আইনের' বিরুদ্ধে পরক্ষণেই 'ন্যায্য বিধান' ঘোষণা করে তিনি বলেন,

*"আমরা ঈশ্বর ও মাতার নিকট ভ্রাতাদের "**অর্দ্ধেক**" নই। তাহা হইলে এইরুপ স্বাভাবিক বন্দোবস্ত হইত—পুত্র যেখানে দশ মাস স্থান পাইবে, দুহিতা সেখানে পাঁচ মাস!!...আমরা জননীর স্নেহ মমতা ভ্রাতার সমানই ভোগ করি। মাতৃহৃদয়ে **পক্ষপাতিতা** নাই[২৭]।"*

রোকেয়া ইঙ্গিত করেন, 'মুহম্মদীয় আইন' নারীর প্রতি একচোখা আচরণ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা পক্ষপাতী নন। মায়ের ভালোবাসাও কোনো পক্ষপাতিত্ব করে না।

❑ পবিত্র কুরআনে মিরাসের বিধান নাযিল করে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান-সন্ততির (অংশ) সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, **পুরুষ দুই নারীর অংশের সমান পাবে**, তবে সন্তান-সন্ততি যদি শুধু দু'জন নারীর অধিক হয় তাহলে তাঁরা রেখে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের দু' ভাগ পাবে, আর কেবল একটি কন্যা থাকলে সে অর্ধেক পাবে এবং তার পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকে রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তার সন্তান থাকে, আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিশ মাতা-পিতাই হয়, সে অবস্থায় তার মাতার জন্য এক তৃতীয়াংশ, কিন্তু তার ভাই-বোন থাকলে, তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (ঐসব বণ্টন হবে) তার কৃত ওয়াসীয়াত অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমরা জান না তোমাদের পিতা এবং সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের পক্ষে উপকারের দিক

---

[২৫] বেগম রোকেয়া, (২০০৬). *রোকেয়া রচনাবলী.* (পৃ-২৯). বাংলা একাডেমী
[২৬] সম্পত্তি বণ্টনের আইন
[২৭] বেগম রোকেয়া, (২০০৬). *রোকেয়া রচনাবলী.* (পৃ-৩১). বাংলা একাডেমী

দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। **<u>(এ বণ্টন) আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে,</u>** নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাশীল।”

(সূরা আন-নিসাঃ ০৪:১১)

সূরা নিসার ১১-১২ ও ১৭৬ নং আয়াতে সম্পত্তি বণ্টনের নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো আল্লাহ তাআলার বিধান। রাসূল সাঃ ছিলেন শুধুই এর প্রচারক। তিনি এই বিধান তৈরি করেননি, পুরুষ বা নারী কারো প্রতি কখনো পক্ষপাতিত্বও করেননি।

রোকেয়া এখানে শুধু সম্পদের অধিকারের কথাই এনেছেন। কিন্তু সযত্নে পুরুষের উপর থাকা কয়েক গুণ দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা এড়িয়ে গেছেন। নারীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা তার (পিতা, সন্তান, ভাই এভাবে পর্যায়ক্রমে) মাহরাম পুরুষ আত্মীয়দের উপর ন্যস্ত করেছেন। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন, স্বামীর উপর স্ত্রীর হক হল,

“স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। অর্থাৎ, খরচে মাত্রাতিরিক্ত সংকোচন না করা, আবার অযথা খরচেরও সুযোগ না দেয়া।

… বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা[২৮]।”

শুধু তাই না। পরিবারের কারো ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণের[২৯] বাধ্যবাধকতাই নারীর নেই। তাই পিতার সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীরা স্বাভাবিক ভাবেই অর্ধেক পান। পিতা বা অন্য কারো সম্পত্তি থেকে যেটুকু একজন নারী পান, সেটুকু তার কারো জন্যই খরচ করতে হয় না। এটা রোকেয়ার চোখে জুলুম।

অপরদিকে ওই নারীর ভাইয়ের কথা ভাবুন। তিনি বোনের চেয়ে দ্বিগুণ সম্পত্তি পান সত্য। কিন্তু সেই পুরুষটার মা, বোন, সন্তান-সন্ততি, পরিবারের বাকি

---

[২৮] আশরাফ আলী থানভী, (১৯৯৯). *কুরআন হাদিসের আলোকে পারিবারিক জীবন.* বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স

[২৯] নারীদের পিতা-মাতার আর্থিক দায়িত্বও তো দূর, তাদের নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্বও তাদের কাঁধে নয়।

সকল সদস্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে অন্য মাহরাম নারীদের আর্থিক দায়িত্বও তার একার। এমনকি (বোন অবিবাহিতা হলে) অর্ধেক সম্পত্তি পাওয়া সেই বোনের ভরণপোষণের দায়িত্বও তারই কাঁধে। তাহলে এখানে প্রকৃতপক্ষে 'বেশি' কে পেলো[৩০]?

স্পষ্টতই সম্পত্তির সঙ্গে ভালোবাসার এই বালখিল্য তুলনা হাস্যকর। সবদিক বিবেচনা করলে নারীরা ইসলামের বিধান অনুসারে কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা পায়। কোনো ক্রমেই সম্পত্তি বণ্টনের বিধানকে অন্তত পুরুষের প্রতি 'পক্ষপাতমূলক' বলার সুযোগ নেই।

নবী-রাসূলগণ, তাঁদের সাহাবীগণ, পবিত্র ঐশী কিতাবসমূহ, শরিয়াহ আইন, দ্বীন ও ইসলাম সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার বিশ্বাস ও দাবির এই হল সামগ্রিক চিত্র।

রোকেয়া বনাম পর্দা

বলা হয়, নারীদেরকে 'পর্দা' নামক 'কারাগার' থেকে স্বাধীন করতে আজীবন লড়াই করেছেন বেগম রোকেয়া। ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় 'অবরোধ-প্রথা'র থেকে নারীদের মুক্তির সংগ্রামে বেগম রোকেয়া ছিলেন পথপ্রদর্শক।

ব্যাপারটা কি আসলেই তাই? 'পর্দা'র ব্যাপারে রোকেয়া কি বলে গেছেন? কানকথায় কান না দিয়ে স্বয়ং রোকেয়ার কাছ থেকেই শোনা যাক[৩১]।

শুরুটা সেই '**অলঙ্কার না badge of slavery**' দিয়েই। রোকেয়া ঘোষণা করেন,

[৩০] নারী শুধু অর্ধেক সম্পত্তিই পায় না। কখনো পুরুষের সমান পায়, কখনো বেশিও পায়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন '***ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ৩***' বইয়ের '**অর্ধেক কেন? উত্তরাধিকার ও সাক্ষ্য**' অধ্যায়টি।

[৩১] বস্তুত *বোরকা, অবরোধবাসিনী* সহ অসংখ্য রচনায় রোকেয়া 'অবরোধ-প্রথা'কে ইসলামী পর্দার সমার্থক ও পর্দাকে 'অবরোধ-প্রথা'র সমার্থক শব্দ ও পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

"প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহাগোলমাল বাধাইবে, জানি; মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল" (অর্থাৎ প্রাণদণ্ড) এর বিধান দিবেন, এবং হিন্দু চিতানল বা তৃষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি। কিন্তু জাগিতে হইবেই! বলিয়াছি ত কোনো ভাল কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও Galileu বলিয়াছিলেন, "but nevertheless it (Earth) does move"!! আমাদিগকে ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। এ স্থলে পার্সী নারীদের একটী উদাহরণ দিতেছি। নিম্নলিখিত প্যারাটী এক খণ্ড উর্দু সংবাদপত্র হইতে অনুবাদিত হইল :——

"এই পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে পার্সীলেডীদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। **বিলাতী সভ্যতা** যাহা, **তাঁহারা এখন লাভ করিয়াছেন**, পূর্ব্বে ইহার নামমাত্র জানিতেন না। **মুসলমানদের ন্যায় তাঁহারাও পর্দ্দায় অর্থাৎ অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা থাকিতেন**। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ছত্র ব্যবহারে অধীকারিণী ছিলেন না[৩২]। প্রখর রবির উত্তাপ সহিতে না পারিলে জুতাই ছত্ররূপে ব্যবহার করিতেন !! গাড়ীর ভিতর বসিলেও তাহাতে পর্দ্দা থাকিত। অন্যের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিতে পাইতেন না[৩৩]। **কিন্তু আজি কালি পার্সী লেডীগণ পর্দ্দা ছাড়িয়াছেন**; খোলাগাড়ীতে বেড়াইয়া থাকেন; **অন্যান্য পুরুষের সহিত আলাপ করেন**[৩৪]। নিজেরা ব্যবসায় (দোকানদারী) করেন। প্রথমে যখন কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাদের স্ত্রীকে (পর্দ্দার) বাহির করিয়াছিলেন, তখন চারি দিকে ভীষণ কলরব উঠিয়াছিল।

[৩২] নারীরা ছাতা ব্যবহার করতে পারবে না, এটা ইসলামের পর্দাব্যবস্থার কোনো বিধান নয়। এগুলো হাস্যকর কুসংস্কার।

[৩৩] এটাও ইসলামের পর্দাব্যবস্থার কোনো বিধান নয়। স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না, তাহলে কি পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলবে?!

[৩৪] নারীদের জন্য নন-মাহরাম (যাদের সঙ্গে বিয়ে জায়েজ) পুরুষদের সঙ্গে কোনো কারণ ছাড়া ফালতু আলাপ ইসলামে নিষিদ্ধ। অথচ, বেগম রোকেয়া গুণাহ করার এই রাস্তাকে 'নারী স্বাধীনতা' বলে দাবি করেন।

> ধবলকেশ বুদ্ধিমানেরা বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর ধ্বংসকাল উপস্থিত হইল !"
>
> **কই, পৃথিবীরত ধ্বংস হয় নাই। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও**— সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের Equality বুঝিতে হইবে[৩৫]।"

রোকেয়ার মতে, 'বিলাতি সভ্যতা'র ছোঁয়া পেয়ে ইরানী স্বামীরা তাদের স্ত্রীদেরকে পর্দা ছেড়ে বের করেছে। ফলে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলার স্বাধীনতা পেয়ে পুরুষের 'সমান' হওয়ার পথে এগিয়ে গেছে ইরানী নারীরা।

রোকেয়া জানতে চান, **মুসলিম বাঙালি নারীরা এখনো কেন ইতস্তত করছে? তারাও পর্দা ছাড়ুক, বিনা পর্দায় বেড়ানো শুরু করুক, পরপুরুষের সঙ্গে নির্দ্বিধায় কথা বলুক। পুরুষ যা করে, তা-ই করতে পারাই নারীর স্বাধীনতা। নারীরা আজ শুরু করুক, একটা সময় পর সবাই এসব মেনে নিবে।**

১৯০৫ সালে প্রকাশিত *সুলতানার স্বপ্ন*-তেও রোকেয়া তার কল্পকাহিনীতে প্রধান চরিত্রের মুখ থেকে বের করে আনেন,

> "জানেন, ভগিনী সারা! সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর আমাদের কোনো হাত নাই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু,—**তাহারা সমুদয় সুখ সুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে, আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুর রূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছে। উড়িতে শিখিবার পুর্ব্বেই আমাদের ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়**—তদ্ব্যতীত সামাজিক রীতিনীতির কত শত কঠিন শৃঙ্খল পদে পদে জড়াইয়া আছে।"

পর্দা-বিদ্বেষের কারণে সবচে বেশি পরিচিতি সম্ভবত পেয়েছে মৃত্যুর আগে রোকেয়ার লেখা '*অবরোধ-বাসিনী*[৩৬]' (১৯৩১) বইটি। *অবরোধ-বাসিনী*-তে বেগম রোকেয়া পর্দা নিয়ে চরম ঘৃণ্য কিছু মন্তব্য করেন—

---

[৩৫] বেগম রোকেয়া, (২০০৬). *রোকেয়া রচনাবলী.* (পৃ-৬১২-৬১৩). বাংলা একাডেমী
[৩৬] বেগম রোকেয়া, (২০০৬). *রোকেয়া রচনাবলী.* (পৃ-৩৭৯-৪১৪). বাংলা একাডেমী

❑ যিনি যত বেশি **পর্দ্দা করিয়া** গৃহকোণে যত বেশি **পেঁচকের মত** লুকাইয়া থাকিতে পারেন, তিনিই তত বেশি শরীফ।

❑ এক নারীর উদ্ধৃতি দিয়ে "বোরকার ১০১ ক্ষতি" সম্পর্কে রোকেয়া লেখেন—

- তিনি কোনো বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ী শাদীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে [বোরকা সহ] দেখিবামাত্র সেখানকার ছেলে-মেয়েরা ভয়ে চীৎকার করিয়া কে কোথায় পলাইবে, তাহার ঠিক নাই। আরও কয়েক ঘর বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার স্বামীর আলাপ ছিল, তাই তাঁহার সকলের বাড়ীই যাইতে হইত। কিন্তু যতবার যে বাড়ী গিয়াছেন, ততবারই ছেলেদের সভয় চীৎকার ও কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছেন। [বোরকা দেখিয়া] ছেলেরা ভয়ে থরথর কাঁপিত।
- তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা চারি পাঁচ জনে **বোরকাসহ** খোলা মোটরে বাহির হইলে পথের ছেলেরা বলিত, "ওমা! ওগুলো কি গো?" একে অপরকে বলে "চুপ কর!-এই রাত্রিকালে ওগুলো ভূত না হয়ে যায় না।" বাতাসে **বোরকার নেকাব** একটু আধটু উড়িতে দেখিলে বলিত— "দেখরে দেখ। **ভূতগুলোর শুঁড় নড়ে**—! বাবারে! পালা রে!"
- তিনি এক সময় দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন। ঘুম ষ্টেশনে পৌঁছিলে দেখিলেন, সমবেত জনমণ্ডলী একটা বামন লোককে দেখিতেছে-বামনটা উচ্চতায় একটা ৭/৮ বৎসরের বালকের সমান, কিন্তু মুখটা বয়োপ্রাপ্ত যুবকের,—মুখভরা দাড়ী গোঁফ। হঠাৎ তিনি দেখিলেন, জনমণ্ডলীর কৌতূকপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার দিকে! দর্শকেরা সে বামন ছাড়িয়া এই বোরকাধারিণীকে দেখিতে লাগিল!
- তিনি পদব্রজে বেড়াইতে বাহির হইলে পথের কুকুরগুলো ঘেউঘেউ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিত[৩৭]। দুই একটা পার্ব্বত্য ঘোড়া তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে সওয়ার শুদ্ধ লাফালাফি আরম্ভ করিত। একবার চায়ের বাগানে বেড়াইতে গিয়া দেখেন, তিন চারি বৎসরের এক বালিকা মস্ত ঢিল তুলিয়াছে, তাঁহাকে মারিতে[৩৮]!

---

[৩৭] তার বোরকা দেখে ভয় পেয়ে এই কাজ করতে চেয়েছে।

[৩৮] তাকে পর্দাসহ দেখে ভয় পেয়ে।

- কেবল ইহাই নহে, পথের লোক রোরুদ্যমান শিশুকে চুপ করাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিত,—**"চুপ কর, ঐ দেখ মক্কা মদিনা যায়,**—ঐ!"- **ঘেরাটোপ জড়ানো জুজুবুড়ী,—ওরাই মক্কা মদিনা**!!"

❑ "জনাব শরফদ্দীন আহমদ বি· এ· (আলীগড়) আজিমাবাদী-র বরাতে রোকেয়া 'হাস্যকর' পর্দার কৌতুক বর্ণনা করেন, যেখানে তিনি লেখেন,

"গত বৎসর পর্য্যন্ত আমি আলীগড়ে ছিলাম। যেহেতু সেখানকার ষ্টেশন একরূপ জাঁকজমকে ই· আই· আর· লাইনে অদ্বিতীয় বোধ হয়, সেই জন্য আমি প্রত্যহই পদব্রজে ভ্রমণের সময় **ষ্টেশনে** যাইতাম। সেখানে **অন্যান্য তামাসার মধ্যে অনেকগুলি ১৩শ শতাব্দীর বোরকা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আর খোদা মিথ্যা না বলান, প্রত্যেক বোরকাই কোনো না কোনো প্রকার কৌতুকাবহ ছিল**।"

❑ সবার শেষে বেগম রোকেয়া তার জীবনের অন্যতম আফসোসটুকু দুই লাইনে ফুটিয়ে তুলে বলেন,

"কেন আসিলাম হায়! এ পোড়া সংসারে

কেন জন্ম লভিলাম পর্দ্দা-নশীন ঘরে!"

এখানে কিছু ব্যাপার বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। রাসূল সাঃ পর্দার যে বিধান মুসলমানদের যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সাহাবীগণের হাত ধরে সে বিধান সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। সামান্য পার্থক্য সহ আজও মুসলিম নারীগণ সেভাবে পর্দার বিধান পালন করেন। গোটা পৃথিবীর সমগ্র অঞ্চলের অসংখ্য নারী আজও বোরকা পরিধান করেন। আজো অসংখ্য মা-বোনদের বোরকা একেবারে সাদামাটা। কোনো চাকচিক্য নেই।

বেগম রোকেয়ার সময়কার প্রায় সকল মুসলিম নারীও সাদামাটা বোরকাই ব্যবহার করতেন। তাদের বোরকায় আভিজাত্যের চিহ্ন ছিল কম, দারিদ্র্যের চিহ্ন ছিল বেশি। কারণ সে সময় ব্রিটিশদের শোষণ আর জুলুমের শিকার মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই করুণ। এটা ঐতিহাসিক সত্য।

কিন্তু বাস্তবতা হল, বোরকা দেখে কোনো কুকুর, ঘোড়া ভয় পায়—এমন অদ্ভুত তথ্য সুদূর চৌদ্দশত বছর আগ থেকে আজ পর্যন্ত গোটা পৃথিবীর কোনো মুসলমান কোথাও শুনেছে বা দেখেছে কী? একই সঙ্গে বোরকা পরা নারীকে দেখে কোনো বাচ্চা 'ভূত' ভেবে অজ্ঞান হয়েছে—এমন ঘটনাও যে বাস্তবসম্মত নয়, তাতে আশা করি সকলেই একমত হবেন[৩৯]।

যদি এগুলো স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই হতো, তাহলে আজও অগণিত মুমিনা নারীদের জৌলুষহীন বোরকা দেখে অহরহ কুকুর ক্ষেপে কামড়ে দিতো, ঘোড়া লাফিয়ে উঠত, বাচ্চা অজ্ঞান হয়ে যেতো। আর সোশ্যাল মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সেসব হতো ভাইরাল। কিন্তু সেরকম কোনো ঘটনাই কোথাও ঘটছে না কেন? কুকুরগুলো, ঘোড়াগুলো কি সব শিক্ষিত হয়ে গেছে? বাচ্চারা কি বোরকা-নিকাব চিনে মায়ের উদর থেকে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে?

স্বাভাবিক বোধশক্তি আর কাণ্ডজ্ঞানই বলে, রোকেয়ার এই দাবি বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর জন্য রকেট সাইন্স দরকার পড়ে না। তাছাড়া স্বয়ং রোকেয়াই স্বীকার করেছেন সে যুগে সব নারীই 'কঠোর' পর্দা করতেন। তাহলে বাচ্চা-বুড়ো, কুকুর-ঘোড়া বোরকা, নিকাবের মতো খুবই প্রচলিত একটি পোশাক দেখে চমকে উঠবে—সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ এ দাবি কীভাবে করতে পারে?

কথার পিঠেও কথা আছে। শিশু, কুকুর কিংবা ঘোড়া হয়তো ভয় পায় না। তবে

যারা সাদামাটা পর্দা করে, সেইসকল মা-বোনকে দেখে আজও কিন্তু অজ্ঞ ও মূর্খরা 'খালাম্মা', 'তাবু' ইত্যাদি বলে অপমান করে; চৌদ্দশ বছর আগের বর্বর, সেকেলে পোশাক বলে হয়রানি করে। দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলিম নারীরা এমন জুলুমের শিকার অহরহ হচ্ছেন।

রোকেয়া ও তার অনুসারীদের দাবি, '**নারীদের ঘরবন্দি করে রাখতে আলেমরা পর্দার নামে মিথ্যা কথা বলেন**'।

---

[৩৯] অবশ্য ইসলামের বিরোধীরা এ ঘটনাকে স্বাভাবিক বিষয় বলে দাবি করতেও পারে।

ওরা বলতে চায়, **স্বয়ং রাসূল সাঃ যাদেরকে নিজের ওয়ারিশ বলে গেছেন, যারা নবীজির ইলম নিয়ে আজীবন চর্চা ও গবেষণা করেন, সেই ওলামায়ে কেরামগণ সকলেই অজ্ঞ, মূর্খ আর মিথ্যাবাদী**। আর কুরআন, ইসলামের আকীদা, ফিকহ, তাফসীর, হাদীসের কোনো কিতাবের পৃষ্ঠাও কোনোদিন উলটে দেখে না, তাদের কাছেই আছে পর্দার সব গোপন জ্ঞান।

এখন প্রশ্ন হল, **ইসলামের যে হুকুম-আহকাম, তা আপনি কীভাবে জানবেন? বেগম রোকেয়ার কাছ থেকে?** যিনি নারী রাসূল সাঃ-কে মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দেন? কুরআনসহ সকল আসমানি কিতাবকে অস্বীকার করেন? সাহাবীদেরকে গালি দেন সেই রোকেয়ার কাছ থেকে? যারা ভুল করেও কেবলামুখী হয়ে হোঁচট খায় না তাদের থেকে?

পর্দার বিধান সম্পর্কে জানতে হলে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই যেতে হবে রাসূলের কাছে, শ্রেষ্ঠ তিন প্রজন্মের কাছে। দেখতে হবে—

- **উম্মাহাতুল মুমিনীন আয়েশা রাঃ, জান্নাতি নারীদের সর্দার ফাতিমা রাঃ, রাসূল সাঃ-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ এবং সমসাময়িক নারীরা কীভাবে পর্দা করতেন**।
- **চার খলীফার সময়ে পর্দাব্যবস্থা কেমন ছিল**। তারা কিভাবে পর্দার বিধান প্রয়োগ করেছেন।
- শ্রেষ্ঠ তিন প্রজন্ম[৪০] তথা **সালফে সালেহীনদের সময়ে পর্দাব্যবস্থা কেমন ছিল**।
- সর্বোপরি **পর্দার ব্যাপারে শরীয়াহ আইন কি বলে**।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাঃ মুমিন নারী-পুরুষদের পর্দার যে বিধান প্রতিষ্ঠার হুকুম দিয়েছেন, সেটা উল্লিখিত ব্যক্তিগণ সবচে ভালো উপলব্ধি করেছেন।

---

[৪০] সাহাবী, তাবীঈ, তাবে তাবীঈ।

আর নিজেদের জীবনে, তৎকালীন মুসলিম সমাজে সেভাবেই প্রয়োগ করেছেন।

তাই আমাদের উচিত, পর্দার বিধানকে বিশ্বস্ত কোনো আলিমের কাছ থেকে সেই সম্মানিত মানুষগুলোর মতো করেই শিখে নেওয়া। সেই সাথে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করা জগৎশ্রেষ্ঠ আলিমদের বইগুলো পড়া।

পর্দা ব্যবস্থা নিয়ে লেখা অসংখ্য মুসলিম মনীষীর অসংখ্য বইয়ের সব এখানে বলা সম্ভব নয়। তবে, নিচের বাছাই করা কিছু বই আপনাকে পর্দাব্যবস্থা সম্পর্কে মৌলিক একটা ধারণা দিবে ইনশাআল্লাহ—

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-র '**নারী ও পর্দা (কি ও কেন?)**',

ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী হাফিযাহুল্লাহ-র '**ভার্সিটির ক্যান্টিনে**',

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.-র '**কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা**',

শাইখুল ইসলাম ইমাম তাকিউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া রহ.-র '**মুসলিম নারীর হিজাব ও সালাতে তার পোশাক**',

মুফতী মুহাম্মদ হাবিব ছামদানীর '**কুরআন ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা**'।

এগুলো সহ আরও অনেক বই আপনার হৃদয়কে আলোকিত করতে সক্ষম। প্রতিটি বইয়ের লেখকই মুসলিম উম্মাহর কাছে যেমন সম্মানিত, তেমনি বইগুলোও পৃথিবী জুড়ে লাখো মুমিনা-মুসলিমাহ বোনের ঈমানি জীবনের সঙ্গী।

রোকেয়াঃ মুসলিম নারীদের আদর্শ?

রোকেয়া কি মুসলিম নারীদের জন্য আদর্শ? এই প্রশ্নের জবাব পেতে চাইলে আগে জানতে হবে—রোকেয়া কি মুসলিম ছিলেন?

হয়তো অবাক হতে পারেন এই ভেবে যে, এ প্রশ্নটা এতদিন পর কোত্থেকে আসলো। প্রশ্নটি আসলো মুহাম্মাদ সাঃ ও ঈসা আঃ সহ সকল নবী-রাসূলগণ, কুরআন সহ ঐশী কিতাবসমূহ, শরিয়াহ আইন, পর্দার বিধানের প্রশ্নে রোকেয়ার অবস্থান থেকে। তাছাড়া আজ রোকেয়াকে 'মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সমাজে। আর ইসলামের সীমানা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া কোনো ব্যক্তি মুসলিমদের আদর্শ হতে পারে না। তাই রোকেয়ার ঈমানী অবস্থান পুনঃযাচাই করা জরুরী।

তার আগে চলুন ঈমান ও কুফর কি—তাতে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিই—

ঈমানের ছয় রুকন

❑ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঈমানের স্তম্ভগুলোর ব্যাপারে বলেন,

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহতে, তাঁর রাসূলে, তাঁর রাসূলের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আন। এবং কেউ আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকালকে অবিশ্বাস করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।"

(সূরা নিসা ০৪:১৩৬)

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা একত্রে বা আলাদাভাবে উপরের বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন হাদিসেও ঈমানের ৬টি রুকন উল্লিখিত

হয়েছে। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, ঈমানের পরিচয় দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,

“(ঈমান এই যে) তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহতে [১], তাঁর ফিরিশতাগণে [২], তাঁর কিতাবসমূহে [৩], তাঁর সাক্ষাতে, তাঁর রাসূলগণে [৪] এবং তুমি বিশ্বাস করবে শেষ পুনরুত্থানে [৫] এবং তুমি বিশ্বাস করবে তাকদীর [৬] বা নির্ধারণের সবকিছুতে[৪১]।”

এ ছয়টি বিষয়ে—আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, আখেরাত এবং তাক্বদীর—ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা ইসলামে প্রবেশ করার মৌলিক শর্ত। আর সহজ করে বললে, এই মৌলিক শর্ত অস্বীকার করার অপর নামই ‘**কুফর**’।

কুফর

কুফরের সর্বোত্তম সংজ্ঞায় সব বিতর্ক ও আপত্তির বাইরে থাকার উদ্দেশ্যে ঈমামগণ নিচের সংজ্ঞাটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন—

“যেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনা অপরিহার্য তার উপর ঈমান না আনা (একেই কুফর বলে[৪২])।”

অর্থাৎ, ইসলামের মৌলিক, অকাট্য বিষয়গুলো যদি কেউ সজ্ঞানে অস্বীকার করে, তবে তার ঈমান নেই বলে ধরে নিতে হবে।

---

[৪১] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৭, ৪/১৭৩৩; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৯, ৪০, ৪৭

[৪২] *শারহুল মাকাসিদ*, তারিফুল কুফরঃ ৩/৪৫৮ Cited in *কুফর ও তাকফীর*, আলী হাসান ওসামা, ৬৫, কালান্তর প্রকাশনী

রাসূল সাঃ-কে অস্বীকারের কুফর

আব্দুল্লাহ ইবনু ’উমার (রাঃ) বলেন, রাসূল সাঃ বলেছেন,

“পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। এ সাক্ষ্য দেয়া যে, **আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল**, সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ক্বায়িম করা, যাকাত আদায় করা, হাজ্জ (হজ/হজ্জ) পালন করা এবং রমাযান মাসের সিয়াম পালন করা[৪৩]।”

বেগম রোকেয়া রাসূল সাঃ-কে মিথ্যাবাদিতা, প্রতারণা ও ভন্ডামির অপবাদ দিয়েছেন। ‘**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ**’[৪৪], এই কালিমার দ্বিতীয় অংশ—“**মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল**”—টুকু রোকেয়া অস্বীকার করেছেন।

যে ব্যক্তি কালিমাকে-ই[৪৫] মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, এমন ব্যক্তি মুসলিম না কাফির?

❑ *আল ফিকহুল আকবার*-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমুল্লাহ বলেন,

“আল-ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহে বিশ্বাস অর্থ আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাস। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন,

---

[৪৩] সহীহ: বুখারী ৮, মুসলিম ১৬, তিরমিযী ২৬০৯, নাসায়ী ৫০০১, আহমাদ ৬০১৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১৮৮০।

[৪৪] আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল

[৪৫] “রাসূল সাঃ আল্লাহর নবী”—এই অংশটুকু।

তোমরা কি জান ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহে বিশ্বাস কি... এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাঃ তাঁর রাসূল। অন্য বর্ণনায়ঃ আল্লাহ ছাড়া তার কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।"[৪৬]

অর্থাৎ, আল্লাহর উপর বিশ্বাসের শর্ত হল রাসূল সাঃ-কে বিশ্বাস করা। যে ব্যক্তি রাসূলকে বিশ্বাস করলো না, সে প্রকারান্তরে আল্লাহকেই অস্বীকার করলো।

❑ বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরামের অন্যতম ওস্তাদ, দেশের জাতীয় মসজিদের বর্তমান খতিব মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক বলেন,

"ইসলামের নবী (কিংবা ইসলামের কোনো নিদর্শন) সম্পর্কে কটূক্তিকারী, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কিংবা কোনো বিধানের অবজ্ঞা ও বিদ্রূপকারী যদি মুসলিম পরিবারের সন্তান হয়, মুখে কালিমা পাঠকারীও হয়, **তবুও সে কাফির ও মুসলমানের দুশমন**। শরীয়তের পরিভাষায় এই প্রকার কাফিরের নাম 'মুনাফিক', 'মুলহিদ' ও যিনদীক।

এই স্পষ্ট বিধান এখন এজন্যই বলতে হচ্ছে যে, আমাদের সমাজে এমন লোকদের কুফরী কর্মকাণ্ড থেকেও বারাআত (সম্পর্কহীনতা) **প্রকাশ নিজের ঈমান রক্ষার জন্য অপরিহার্য মনে করা হয় না; বরং এদের সাথেও মুসলমানের মতো আচরণ করা হয়**, এদের প্রশংসা করা হয়, **এদেরকে 'জাতীয় বীরে' পরিণত করার চেষ্টা করা হয়**[৪৭]।"

অর্থাৎ, রাসূলকে অস্বীকার করে কোনো ব্যক্তি যতই কুরআন হাদিস আর সলাত আদায় করুক না কেন, সেই ইবাদত তাকে মুরতাদ থেকে মুসলিম বানিয়ে দিবে না।

---

[৪৬] ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর. *আল ফিকহুল আকবার.* (পৃ-১৬৪-১৬৫). As-sunnah Publications

[৪৭] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক. *ঈমান সবার আগে.* (পৃ- ২১). মাকতাবাতুল আশরাফ

রিসালাত অস্বীকারের কুফর

বেগম রোকেয়া রাসূল সাঃ, ঈসা আঃ সহ **সকল নবী-রাসূলদের নবুওয়াত অস্বীকার করেছেন, তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছেন**। এ প্রসঙ্গে সম্মানিত আলিমগণের বক্তব্য চলুন জেনে নিই—

❑ আল্লামা কাশ্মীরি রহ. বলেন, "আমি হাফিজ ইবনু তাইমিয়া রহ.-এর *আস-সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল* কিতাবের কয়েকটি সঞ্চয়ন উক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে উপস্থাপন করছি। আর তা হলো,

নবী-রাসূলগণের দোষত্রুটি তালাশ করা এবং তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা পরিষ্কার কুফর; বরং সবচে বড় কুফর। ইবনু তাইমিয়া রহ. তার উক্ত কিতাবে এ বিষয়ে সবিস্তর আলোচনা করেছেন এবং আলোচনাটিকে কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসভিত্তিক দলিল-প্রমাণ দ্বারা অত্যন্ত শক্তিশালী করেছেন।... (**যে নবী-রাসূলদের দোষ-ত্রুটি খুঁজবে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে**) তাকে তাওবা করতে আদেশ দেয়া হবে কি না এবং পার্থিব বিষয়ে তার তাওবা কবুল করা হবে কি না, এ বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু **তার কাফির হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো মতানৈক্য নেই**।[৪৮]"

আল্লামা কাশ্মীরি রহ. 'ইতহাফ' কিতাবে আরও লিখেন,

"**কোনো নবীর** প্রেরিত হওয়া এবং তার দাওয়াত ও তাবলীগকে **মিথ্যায়ন করা** যুক্তিযুক্তভাবে একটি মন্দ কাজ। তাই তার কুফরটা যুক্তিগত মন্দ সংক্রান্ত **কুফরের অন্তর্ভুক্ত** হবে।[৪৯]"

---

[৪৮] আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি. *ইকফারুল মুলহিদিন.* (পৃ-২০৪). Darul Arqam

[৪৯] আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি. *ইকফারুল মুলহিদিন.* Darul Arqam

অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি নবী-রাসূলগণের নামে মিথ্যাচার করলে ও তাঁদেরকে প্রতারণা, ভণ্ডামির অপবাদ দিলে তাকে মুসলিম বলার কোনো সুযোগ নেই।

আসমানি কিতাব, আখিরাত অস্বীকারের কুফর

ঈমানের অন্যতম দুটি রুকন আসমানি কিতাব ও আখিরাত। আর এ রুকনসমূহ অস্বীকারের ব্যাপারে আলিমগণ কি বলেছেন?

❑ *আল ফিকহুল আকবার*-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে তাকফীরের ব্যাপারে বহু সতর্কতামূলক কথা ও হুশিয়ারি উচ্চারণ করার পরও ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমুল্লাহ শেষ পর্যন্ত এ কথাই বলেছেন,

"মুসলিম নামধারী ব্যক্তিকে 'কাফির' বলা মূলত নির্ভর করে তার স্বীকৃতির উপর। যদি সে তাওহীদ, রিসালাত বা আরকানুল ঈমানের মৌলিক কোনো বিষয়কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করে তাহলে তাকে কাফির বলে গণ্য করতে হবে।[৫০]"

এর থেকে সহজ করে আসলে বোঝানো কঠিন। আপনি রাসূল সাঃ কুরআন সহ সকল নবী-রাসূলগণ এবং আসমানি কিতাবের কিছুই বিশ্বাস করেন না, তাহলে আপনি কীভাবে মুসলিম বলে নিজেকে দাবি করতে পারেন?

কাদিয়ানিদের কথাই চিন্তা করুন। ওরা শুধুমাত্র 'খতমে নবুওয়াত' অর্থাৎ রাসূল সাঃ-ই সর্বশেষ নবী, এ কথাটুকু স্বীকার করে না। শুধু এই একটি কারণেই উম্মাহ আজ ঐক্যমত যে, কাদিয়ানিরা মুরতাদ ও কাফির।

---

[৫০] ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর. *আল ফিকহুল আকবার.* (পৃ-৩২৮). As-sunnah Publications

❑ *আল ফিকহুল আকবার*-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে, ইমাম তাহাবী বলেনঃ

"যেসব বিষয় বান্দাকে **ঈমানের অন্তর্ভুক্ত** করেছে, এমন কোনো বিষয় অস্বীকার না করলে, সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয় না।"

এ বিষয়ে মোল্লা আলী কারী রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে,

" 'আহলু কিবলা' বলতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলি যারা মেনে নিয়েছেন তাদেরকে বুঝানো হয়। তাওহীদ, **রিসালাত, আরকানুল ঈমান** ও **আনুষঙ্গিক সকল বিষয় যা কুরআন কারীমে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে**, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম যে বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন বা যে বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ এরূপ কোনো বিষয় যদি কেউ অস্বীকার করেন বা অবিশ্বাস করেন তবে তাকে 'আহলু কিবলা' বলা হয় না...মুহাম্মাদ সাঃ-এর রিসালাতের সর্বজনীনতা বা খাতমুন নবুওয়াত অস্বীকার করা, কাউকে কোনো পর্যায়ে তার শরীয়াহর উর্ধ্বে বলে বিশ্বাস করা, আখিরাত অস্বীকার করা — **এরূপ অবিশ্বাসে লিপ্ত ব্যক্তি যদি আজীবন কিবলামুখী হয়ে সালাত পড়েন বা ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করেন তবুও তাকে 'আহলু কিবলা' বলা হবে না। কারণ তিনি ঈমানই অর্জন করেননি, কাজেই তার ইসলাম বা কিবলামুখী হওয়া অর্থহীন**।"

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, *আল ফিকহুল আকবার* পুস্তকে ইমামে আযম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন, যার মূল কথা একটিই; ঈমানের দাবিদারকে যথাসম্ভব ব্যাখ্যা ও ওজর-অজুহাতের মাধ্যমে মুমিন বলে গণ্য করার চেষ্টা করা। কিন্তু, **যদি কেউ কুরআনের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিষয় অস্বীকার করার ঘোষণা দেয় তবে সে কাফির**[৫১]।

[৫১] ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর. *আল ফিকহুল আকবার.* (পৃ-৩৪০). As-sunnah Publications

পর্দার বিধান অস্বীকারের কুফর

পর্দার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত নাযিল করেছেন। একই সঙ্গে রাসূল সা-এর জীবনেও আমরা পর্দা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাই। পর্দার প্রয়োগ ও বিস্তৃতির ব্যাপারে সামান্য মতপার্থক্য থাকলেও এ ব্যাপারে ওলামায়ে ইকরাম নববী যুগ থেকেই একমত যে, **পর্দা ইসলামে ফরজ একটি বিধান**।

পর্দাব্যবস্থার মত **জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত** একটি বিষয় অস্বীকার এবং তাকে হেয় করা, ঠাট্টা মশকরা—এ দুটি আচরণের ব্যাপারে আলেমগণ কি বলে দেখি,

❑ আল্লামা কাশ্মীরি রহ. *জাওহারুত তাওহীদ* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

“যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীন ও শরিয়াহর কোনো আবশ্যকীয় বিষয় অস্বীকার করে, **সে কাফির**।”

এছাড়াও হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ.-এর সপ্তয়নসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে,

“যেকোনো **অকাট্য বিষয়** অস্বীকার করা কুফর। এ জন্য এ ধরণের কোনো শর্ত নেই যে, সে তার অকাট্যতা সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে, তারপর সে তা অস্বীকার করবে। এরপর তাকে অকাট্য বিষয় অস্বীকারের ভিত্তিতে কাফির বলে আখ্যা দেয়া হবে। যেমনটি কোনো কোনো কল্পনাপূজারী ব্যক্তি ধারণা করে থাকে। বরং ঐ বিষয়টির অকাট্য হওয়াই শর্ত। [চাই অস্বীকারকারী ব্যক্তি তা জানুক বা না জানুক।] যে কেউ এমন অকাট্য [ইয়াকিনি] বিষয় অস্বীকার করবে, [সে কাফির হয়ে যাবে।] তাকে প্রথমে তাওবা করতে বলা হবে। যদি সে তাওবা করে, তাহলে তো ভালো। আর যদি তা না হয়, তাহলে তাকে কাফির বলা হবে...।”

❑ শায়খ তাকিউদ্দীন সুবকি রহ.-এর ভাষ্য দ্বারাও এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। যা হাফিজ ইবনু হাজার রহ. *ফাতহুল বারি* গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

শায়খ ইবনু হুমাম রহ. *মুসায়ারাহ* গ্রন্থে লেখেন, “**দ্বীনের মূলনীতি এবং দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়কে অস্বীকার করা সর্বসম্মতিক্রমে কুফর**। যেমনঃ কেউ দুনিয়াকে অনন্ত মনে করল..., তাহলে সে সর্বসম্মতভাবে কাফির হয়ে যাবে।”

বেগম রোকেয়া পর্দাকে ‘মক্কা, মদিনা, জুজুবুড়ি, ভূত’ সহ নানা অবমাননামূলক কথা বলে কটাক্ষ করেছেন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছেন। তার ভাষায় পর্দা হল নারী জাতির পায়ের শিকল, যা তাকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে।

এ ধরণের অপব্যাখ্যার ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক তার ***‘ঈমান সবার আগে’*** বইতে বলেন,

“এইসব কুফরী ‘ব্যাখ্যা’ এবং এ জাতীয় আরো অসংখ্য ‘ব্যাখ্যা’ যার আবরণে বেদ্বিন-মুলহিদ চক্র ‘জরুরিয়াতে দ্বীন’ (দ্বীনের সর্বজনবিদিত বিষয়) ও **‘কাওয়াতিউল ইসলাম’** (ইসলামের অকাট্য বিষয়াদি)-এর **অস্বীকার করে** এবং **সেই কুফরীকে ঢেকে রাখার অপচেষ্টা করে, এর দ্বারা তো তাদের কুফরী আরো ভয়াবহ হয়ে যায়**। ‘অস্বীকারে’র সাথে ‘অপব্যাখ্যা’ যুক্ত করে নিজেদেরকে সাধারণ কাফিরের চেয়েও মারাত্মক প্রকারের কাফির—**মুলহিদ, যিন্দীক ও মুনাফিকের** সারিতে অন্তর্ভুক্ত করে।”

অর্থাৎ, রোকেয়ার যে ইরতিদাদ, সেটা সাধারণ কুফরী থেকেও ভয়াবহ। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক বলেন,

“যে কোনো ইরতিদাদ সাধারণ কুফর থেকে ভয়াবহ। সাধারণ কুফর তো সত্য দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা বা গ্রহণ না করা, কিন্তু ইরতিদাদ নিছক বিমুখতাই নয়, এ হচ্ছে বিরুদ্ধতা। সত্য দ্বীন গ্রহণ করার পর তা বর্জনের অর্থ ঐ দ্বীনকে অভিযুক্ত করা, যা নির্জলা অপবাদ। বরং ইরতিদাদ তো সত্য দ্বীনের প্রতি

বিরুদ্ধতার পাশাপাশি 'ইফসাদ ফিল আরদ' (ভূপৃষ্ঠে দুষ্কৃতি)ও বটে। বিশেষত মুরতাদ (সত্য দ্বীন ত্যাগকারী) যখন কটাক্ষ-কটূক্তি এবং অবজ্ঞা বিদ্রূপে লিপ্ত হয়। এ তো সরাসরি 'মুহারিব' (যুদ্ধঘোষণাকারী) ও 'মুফসিদ ফিল আর্দ' (ভূপৃষ্ঠে দুষ্কৃতিকারী) [৫২]।"

রোকেয়ার ইরতিদাদ

অনেকে আবার বলতে পারেন, "**বেগম রোকেয়া তো ইসলামের এই এই বিষয়ে প্রশংসা করেছে। তাহলে সে কীভাবে মুরতাদ হয়?**"

মনে এমন প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, 'নাওয়াকিদুল ঈমান' অর্থাৎ ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ আমরা অধিকাংশই জানি না।

এর ব্যাখ্যা হল, ইসলামের রুকন, অকাট্য বিষয় অস্বীকার করার আগে-পরে বহু কাফির, মুরতাদ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশংসা করেছেন। মুসলিম হবার জন্য ইসলামের প্রশংসা শর্ত নয়। ইসলামে প্রবেশের শর্ত হল, ইসলামের মৌলিক রুকন এবং অকাট্য বিষয়গুলোর উপর ঈমান আনা।

❑ ওলামায়ে ইকরামের শিরোমণি ও জাতীয় মসজিদের খতিব মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক বলেন,

"বিদ্বেষ ও ঈমান একত্র হওয়া অসম্ভব। যার প্রতি ঈমান থাকবে তার প্রতি ভালবাসাও থাকবে। পক্ষান্তরে যার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবে তার প্রতি ঈমান থাকতে পারে না। **অন্তরের বিদ্বেষ সত্ত্বেও যদি মুখে ঈমান প্রকাশ করে তবে তা হবে মুনাফিকী**।

---

[৫২] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক. *ঈমান সবার আগে.* (পৃ- ৩৩). মাকতাবাতুল আশরাফ

...মোটকথা, ইসলাম, ইসলামের নবী ও ইসলামের নিদর্শন ও ইসলামের বিধানসমূহের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা ঈমানের অপরিহার্য অংশ, যা ছাড়া ঈমান কল্পনাও করা যায় না। আর এইসব বিষয়কে অবজ্ঞা, বিদ্রূপ করা, বিদ্বেষ পোষণ করা, এমনকি অপ্রীতিকর মনে করাও কুফরী ও মুনাফিকী। এই মানসিকতা পোষণকারীদের ঈমান-ইসলামের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

...ঈমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইসলামের সকল অকাট্য বিধান ও বিশ্বাসকে সত্য মনে করা এবং কবুল করা অপরিহার্য। **এর কোনো একটিকে অস্বীকার করা বা কোনো একটির উপর আপত্তি তোলাও ঈমান বরবাদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।** যেমন অযু হওয়ার জন্য অযুর সবগুলো ফরয পালন করা জরুরী, কিন্তু তা ভেঙে যাওয়ার জন্য অযুভঙ্গের সবগুলো কারণ উপস্থিত হওয়া জরুরী নয়। যে কোনো একটি কারণ দ্বারাই অযু ভেঙে যায়। তদ্রূপ ঈমান তখনই অস্তিত্ব লাভ করে যখন ইসলামের সকল অকাট্য বিধান ও বিশ্বাস মন থেকে কবুল করা হয়। পক্ষান্তরে এসবের কোনো একটিকেও অস্বীকার করার দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

...আর অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ তো এতোই ভয়াবহ যে, তা শরয়ী দলিলে প্রমাণিত ছোট কোনো বিষয়ে প্রকাশিত হলেও সাথে সাথে ঐ ব্যক্তির ঈমান শেষ হয়ে যাবে এবং তার উপর কুফরের বিধান আরোপিত হবে।

...আকাইদ ও আহকামের বিদ্রূপ কিংবা অস্বীকার তো এজন্যই কুফর যে, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য বর্জন এবং তাঁদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ। সুতরাং গোটা ইসলামকে অস্বীকার বা বিদ্রূপ করা আর ইসলামের কোনো একটি বিষয়কে অস্বীকার বা বিদ্রূপ করা একই কথা! উভয় ক্ষেত্রে একথা বাস্তব যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং ঔদ্ধত্য ও বিরুদ্ধতা প্রকাশ করেছে। ইবলীস তো কাফির মরদূদ হয়েছিলো একটি হুকুমের উপর আপত্তি করেই।

...ইরশাদ হয়েছে-

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, আমার কতক (রাসূল)-এর প্রতি তো ঈমান রাখি এবং কতককে অস্বীকার করি। আর (এভাবে) তারা (কুফর ও ঈমানের মাঝে) মাঝামাঝি একটা পথ গ্রহণ করতে চায়।

এরূপ লোকই সত্যিকারের কাফির। আর আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাদের কারো মধ্যে কোনো পার্থক্য করবে না, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কর্মফল দান করবেন। আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[৫৩]।"

(সূরা নিসা ০৪:১৫০-১৫২)

কুফরে আকবার

❑ 'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা' বইতে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ বলেন,

'আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের উপর এবং ঈমানের রুকনগুলিতে বিশ্বাস না থাকাকেই ইসলামের পরিভাষায় 'কুফর' বলে গণ্য।'

কুফর আবার দুই প্রকার। **বড় কুফর** ও ছোট কুফর। বড় কুফর অর্থাৎ কুফরে আকবারের সংজ্ঞায় ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমুল্লাহ বলেন,

[৫৩] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক. *ঈমান সবার আগে.* মাকতাবাতুল আশরাফ

‘**কুফরে আকবার** বলতে প্রকৃত অবিশ্বাস বুঝানো হয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং প্রকৃত অবিশ্বাসী বা কাফিরে পরিণত করে[৫৪]।’

অর্থাৎ, বেগম রোকেয়া যেসব কুফরীতে লিপ্ত ছিলেন, সেগুলো মারাত্মক পর্যায়ের কুফরে আকবার।

‘**মুহাম্মাদ সাঃ-এর ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা, মহত্ত্ব, রিসালাত, নবুওয়াত, নবুওয়াতের পূর্ণতা, প্রচার ও তাবলীগের পূর্ণতা, নবুওয়াতের বিশ্বজনীনতা, স্থায়িত্ব, সমাপ্তি, মুক্তির একমাত্র পথ** ইত্যাদি কোনো বিষয়ে অস্বীকার, অবিশ্বাস বা সন্দেহ এ পর্যায়ের কুফর। মুহাম্মাদ সাঃ যা কিছু বলেছেন তার কোনো বিষয়কে মিথ্যা বা সন্দেহযুক্ত বলে মনে করাও একই পর্যায়ের কুফর।’

তাকফীরের প্রতিবন্ধকতা

❑ তাকফিরের তিনটি প্রতিবন্ধকতা[৫৫] রয়েছে—

এক. অজ্ঞতা। অপ্রসিদ্ধ বিষয়ে অজ্ঞতা কাউকে তাকফির করার জন্য প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হবে। তবে, জরুরিয়াতে দ্বীন (ইসলামের অকাট্য বিধান) অস্বীকারের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা কোনো অজুহাত হিসেবে বিবেচিত হয় না। বেগম রোকেয়া রিসালাত, কিতাব, নবী-রাসূলদের সম্মান প্রদর্শন, পর্দার বিধান ইত্যাদি বিষয় যেভাবে অস্বীকার করেছেন, সেসবই জরুরিয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া তিনি কুরআন ও হাদিসে বলা এই বিষয়গুলোর সবই জানতেন। নিজ জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম সম্পর্কে তার বিস্তৃত ধারণার ভুরিভুরি

---

[৫৪] ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর. *আল ফিকহুল আকবার.* (পৃ- ৩৯৪-৩৯৫). As-sunnah Publications

[৫৫] আলী হাসান ওসামা. *কুফর ও তাকফির.* (পৃ-১৩০). কালান্তর

প্রমাণ দিয়েছেন। **রোকেয়ার ইসলাম-বিরোধিতা কোনো জ্ঞানের স্বল্পতা নয়, বরং সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত**।

দুই. বাধ্য হওয়া। বেগম রোকেয়াকে কেউ কুফরে লিপ্ত হতে বাধ্য করেনি। তিনি স্বেচ্ছায় এই পথ বেছে নিয়েছেন।

তিন. ব্যাখ্যা থাকা। বেগম রোকেয়ার কুফরি বক্তব্যগুলোরর শরিয়াহ দ্বারা অনুমোদিত এমন কোনো ব্যাখ্যা নেই, যা দিয়ে বলা যাবে—রোকেয়ার এসব কুফরি বক্তব্য কুরআন সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অর্থাৎ, তিনটি ওজরের একটিও রোকেয়ার কথা ও কাজে উপস্থিত নয়।

শেষ কথা

রোকেয়া প্রথম ইরতিদাদ প্রচার করেন '**অলংকার না badge of slavery**' প্রবন্ধে। এরপর আবারো **'আমাদের অবনতি'** প্রবন্ধে নবী-রাসূলদের মিথ্যাবাদী ও আসমানি কিতাবকে প্রতারণা বলে অপবাদ দেন। এই সময়ের আগে-পরে ইসলামের পক্ষে অনেক কথা লিখেছেন তিনি। আবার আল্লাহর বিধানকে 'মুহম্মদীয় বিধান' বলে কটাক্ষও করেছেন। কিন্তু তার ইরতিদাদের জন্য তওবা করেছেন—এর কোন প্রমাণ নেই। খুব সম্ভবত তিনি এগুলোকে গ্রাহ্যই করতেন না।

রোকেয়ার অনেক রচনায় যেমন ইরতিদাদ স্পষ্ট। পাশাপাশি বহু রচনায় ইসলাম-বিদ্বেষ বেশ সূক্ষ্ম, সাধারণ চোখে ধরা পড়ার মতো না। মৃত্যুর পূর্বে '**অবরোধ-বাসিনী**' বইতে তিনি ইসলামের জরুরিয়াতে দ্বীন 'পর্দাব্যবস্থা' নিয়ে আবারো নিকৃষ্ট পর্যায়ের ঠাট্টা মশকরা করেন, যা সুস্পষ্ট কুফরি ও ইরতিদাদ।

অনেকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে, রোকেয়া মুসলিমদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। তিনি মুসলিম নারীদের 'স্বাধীনতা' আদায়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এভাবে তিনি ইসলামের পক্ষে জীবনযাপন করেছেন। হয়তো তিনি মনে মনে তওবা করেছেন।

ইসলাম এভাবে কাজ করে না। রাসূল সাঃ, সাহাবী, তাবিঈ কিংবা তাবি তাবিঈগণ—কেউই প্রকাশ্য মুরতাদকে মনে মনে মুসলিম গ্রহণ করেছেন বলে ছেড়ে দেননি। ইসলামী শরিয়াহ-র একটি মূলনীতি হল, ঈমান ও কুফরের ক্ষেত্রে বাহ্যিক দিকটাই বিবেচিত হবে। কে মনে মনে তওবা করল বা ইসলাম ত্যাগ করল, কারও অন্তর চিরে তা যাচাই করা সম্ভব না। তাই কেউ যদি সুস্পষ্টভাবে ইরতিদাদে লিপ্ত হয়, তাহলে এরপর সারাজীবন একটানা সলাত, যাকাত, হজ্জ আর অন্যান্য ইবাদত করে গেলেও তাকে কাফির হিসেবেই গণ্য করা হবে, যদি না সে প্রকাশ্যে তওবা করে থাকে। প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ, প্রকাশ্যে তওবা[৫৬]।

আর ইসলামের গণ্ডির বাইরে থাকা মানুষদের জন্য দুআ করা, জান্নাত কামনা করা জায়েয নয়। বরং, কারও ইরতিদাদ বা ধর্মত্যাগ সুস্পষ্ট হয়ে গেলে [তার ইরতিদাদ সম্পর্কে জানার পরও] তাকে মুসলিম মনে করাও কুফরি।

বেগম রোকেয়া তার জীবদ্দশায় বেশ কয়েকটি গুরুতর, ভয়ংকর কাজে লিপ্ত ছিলেন। ফিকহের বড় বড় ইমামদের মতে যেগুলোর প্রায় প্রতিটিই স্বতন্ত্রভাবে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। যেমন—

- রাসূল সাঃ-কে মিথ্যুক, ভণ্ড ও স্বেচ্ছাচারী দাবি [সুস্পষ্ট কুফর]
- ঈসা আঃ-কে সুচতুর মিথ্যুক, প্রতারক দাবি [সুস্পষ্ট কুফর]
- সকল নবী ও রাসূলদের ভণ্ড ও মিথ্যুক দাবি [সুস্পষ্ট কুফর]

---

[৫৬] আরও জানতে দেখুন,
IslamQA. (২০১৯, August ৩১). *Attitude towards sinners who commit sin openly* (Fatwa No. ২৩৯০৮৯). https://islamqa.info/en/answers/২৩৯০৮৯/attitude-towards-sinners-who-commit-sin-openly

- কুরআনসহ সকল আসমানি কিতাবকে মিথ্যা, ভুয়া, প্রতারণা দাবি [সুস্পষ্ট কুফর]
- আল্লাহর বিধান তথা শরিয়াহ আইনকে অস্বীকার [সুস্পষ্ট কুফর]
- জাহান্নাম তথা আখিরাতকে অস্বীকার [সুস্পষ্ট কুফর]
- মুহাম্মাদ সাঃ-সহ সকল নবী-রাসূলগণের সাহাবীদেরকে অসভ্য, বর্বর, বুদ্ধিহীন, মূর্খ বলে কটূক্তি [সুস্পষ্ট কুফর]
- দ্বীন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান (পর্দা) সম্পর্কে বিদ্বেষ পোষণ [সুস্পষ্ট কুফর]
- দ্বীন ইসলামের বিধান (পর্দাব্যবস্থা) নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা [সুস্পষ্ট কুফর]
- আদম আঃ ও হাওয়া আঃ সম্পর্কে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ [ব্যাখ্যাসাপেক্ষ]

অর্থাৎ, রোকেয়ার দাবিসমূহ আমাদেরকে একটি উপসংহারে নিয়েই কেবল দাড় করায়। সেটি হল, রোকেয়া একজন মুরতাদ, কাফির। ভারতের অধিবাসী হিসেবে তিনি**ই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে নবী-রাসূলগণ ও আসমানি কিতাবসমূহের অবমাননা করেন।** নিজের জীবদ্দশায় **ভারত-বাংলার মুসলিম নারীদের উপর প্রথম ও সবচে বড়** যে প্রভাব **বেগম রোকেয়া ফেলেছেন** সেটি হল—**এ অঞ্চলের মানুষদেরকে তিনিই সর্বপ্রথম ইরতিদাদ বা ধর্মত্যাগের শিক্ষা দেন**। তার আগে সরাসরি এ জঘন্য কাজের আর কোনো উদাহরণ সম্ভবত ভারতবাসী দেখেনি।

রোকেয়ার সামগ্রিক কীর্তি ও ইসলামের বিধানসমূহ আমাদের এ কথাই বলতে বাধ্য করে, বেগম রোকেয়া **~~মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত~~** নয়, বরং মুসলিমবঙ্গে ইসলাম-বিদ্বেষ, মুসলিম-বিদ্বেষ ও পর্দা-বিদ্বেষের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া। মুসলিম নারী ধ্বংসের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া।

আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরকে সত্য গ্রহণ করার জন্য প্রসারিত করে দিন। অন্যদেরকেও রোকেয়ার প্রকৃত পরিচয় জানানোর তৌফিক দিন।

আমাদের সন্তানদের ইসলাম-বিদ্বেষী রোকেয়ার ইরতিদাদের ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করুন।